প্রকাশক

কুনালকুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭২

প্রচ্ছদশিল্পী
প্রবীর সেন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

পরিবেশক :
এ, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক
টি ঘোষ
২ জি, নিলমণি মিত্র রো
কলকাতা-৭০০ ০০২

প্রাক্‌কথন

নাভানা তার প্রকাশন শুরু করেছিল 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশ ক'রে—প্রেমেন্দ্র মিত্রর শ্রেষ্ঠ কবিতা। তারপর প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। একজন কবির শ্রেষ্ঠ ফসল একটি বইতে তুলে ধরার এই প্রয়াস পরবর্তীকালে আরো অনেক প্রকাশক গ্রহণ করেছেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর মতো একজন নিমগ্ন ব্যক্তি-পৃথিবীর কবির—যিনি নিঃসন্দেহে বাংলা-কবিতায় তাঁর মৌলিক প্রস্বর যুক্ত করে দিতে পেরেছেন—শ্রেষ্ঠ রচনা উপহার দিতে পেরে নাভানা তার প্রয়াস অব্যাহত রাখছে।

নাভানার পক্ষে

ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

পল্লব মিত্র

ভূমিকা

আমি যাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব'লে বেছেছি, অন্যেরা তার সঙ্গে একমত না-ও হ'তে পারেন, তবু শেষ পর্যন্ত কবিতা নির্বাচন আমি নিজেই করেছি, এমনকি আমার কাব্যানুরাগীদের সাহায্য-ও নিই নি। "শ্রেষ্ঠ" শব্দটি আপেক্ষিক, এবং বিতর্কসাপেক্ষ—সুতরাং অন্য আরো দু'একজন কবির মতো আমিও এই সংকলনকে "নির্বাচিত কবিতা" ব'লতে চাই। আমার আটটি প্রকাশিত কবিতার বই থেকেই কবিতা প্রধানত বেছেছি আমি, অবাঞ্ছিত কোনো কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিনি, অপ্রকাশিত কবিতা তো নয়ই। শুধু আমি চেষ্টা করেছি যে সংকলিত কবিতাগুচ্ছ যেন কালানুক্রমিক হয়, যাতে পাঠক আমার কবিতার ক্রমবিবর্তনকে অনুভব করতে পারেন। গাছের ডালপালা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কাণ্ড ও শিকড় একই থাকে, বা যদি আরো একটু অন্যভাবে বলি, সমস্ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও একটা অচ্ছিন্ন সত্তা হয়তো কোথাও থেকে যায়। যাকে আমি নাম দিয়েছি জীবনবোধ। কবিতার সঙ্গে যুক্ত হ'লো আমার একটি কাব্যনাটক।

'নাভানা'-র শ্রীপল্লব মিত্রকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাড়া দিয়ে এই সংকলনটি করিয়ে নিলেন। কয়েকজন তরুণ কবির কথা মনে পড়ছে (বিশেষত একজনের) যাঁরা দীর্ঘদিন ধ'রে আমার "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র বিষয়ে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের প্রত্যাশা হয়তো পূর্ণ হ'লো।

কলকাতা ১৯৬০ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য কবিতার বই

এক ঋতু (শতভিষা)
সদর স্ট্রীটের বারান্দা (কৃত্তিবাস)
শুধু বিচ্ছিন্নতা নয় (বিশ্ববাণী)
নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি (আনন্দ)
হাওয়া, স্পর্শ করো (ঈশান)
মানুষের দিকে (করুণা)
অন্ধ প্রাণ, জাগো (আনন্দ)
নিঃশব্দ শিকড় (প্রমা)
This Life (Writer's Workshop)

সূচিপত্র

নাটক

পাঁচটি কবিতা

উৎসর্গ

শ্রীবুদ্ধদেব গুহ ও শ্রীমতী ঋতু গুহ

আবহমান

যখন বর্ষণ শুরু তোমার শরীরে,
আমি যার স্পর্শজীবী শস্যশিকড়ের
স্রোতঃস্বনা অভিমান, তখনি প্রেমের
আকাঙ্ক্ষিত বিনিময়ঃ স্বপ্নে, সহবাসে।

তখনি, প্রাচীন, দূর, পূর্বপুরুষের
রক্তের নিভৃত ঋণে স্ফীতশিরা-আঁকা বাসনার
কোনো হাত নেমে আসেঃ অন্ধকারে যার
একবারে পড়া যায় কররেখা, রেখার নিয়তি ।।

মন্দির

রুদ্র নখে রক্ত-আভা ফোটে।
ক্ষুধিত পাষাণে তবু নিপুণ সাধনা
প্রাণের শিকড় ধ'রে স্বাদুতার তটে
জাগায় অমলবীজ, কায়ারূপ,—ধ্রুব আরাধনা
বাটালি, তুলিব টানে দূরাভাস রেখায় রেখায়
গভীর কোরকে তোলে শোণিতার্দ্র কুমারীকমল ;
দ্রাবিড়ে, পল্লবে, চোলে প্রাণরঙ্গ জীবনের জ্যোতি
বারেবারে আলো ঢালে, বারেবারে পিপাসার জল
যাকে আনে সেই গান, মায়ারূপা প্রেমের নিয়তি !

এ-কমল ফোটে থরে থরে
পাথরে সম্বিৎহারা,—তবু তার আভার প্রণয়ে
কোরকবিদারী রেণু সৃষ্টি, স্থিতি, স্থির প্রজননে
স্বয়ংসম্ভূতা কায়া, পরাগের বীর্য বিনিময়ে
জন্মের অমৃতছন্দ বীজমন্ত্রে অসীম প্রাণনে
মুদ্রায় বিভঙ্গে জাগে, স্বপ্নলোভী হৃদয়ের পণে
তারি মূর্ত আদিরূপ, তারি শ্যাম মিলনমাধুরী
পাষাণে ঝংকৃত গাঁথা ; তবু তার ছন্দ নিরূপণে
যন্ত্রণার অভিসার মর্ম ছেঁড়া কঠিন বাসরে ।।

পূর্বপট

তখনও জানোনি দেয়ালের বাধা ছাড়িয়ে
কেউ যে জ্বালছে অন্যঘরের দেয়ালী,
সর্ব্বনাশা যে, তার ত্রিললাট মাড়িয়ে
গোপনগঙ্গা প্রস্তরে খামখেয়ালী।

তুমি একবার বিস্মিত হ'য়ে তাকালে
দেখতে, কঠিন, ভ্রূযুগবিন্ধ ধনুতে
সার্থকতমা উমার অঙ্গে, কাঁকালে
কুমার আসছেঃ ইঙ্গিত বরতনুতে॥

কাণ্ডাঘাট ষ্টেশনে ভোর

গৌরীবধূ আকাশে যাবে না
আলোকলতা কুণ্ঠাময়ী ভোরে,
ছিন্ন ক'রে ছড়িয়ে দিলো তাকে
মহেশ্বর-বাহুর অভিমান।

এপাশে বুঝি কুঁচিফুল ফোটে
ওপারে চাপা কান্না গুরুগুরু,
পৃথিবীময় শান্ত ভোর নামে—
তবুও কারা শুনেছে ডম্বরু!

জানলা

দূরের খাদে তারার কুয়াশা
তুমি আমার পাশে'
একা পাইন আপন-ঠিকানিয়া
বিষণ্ণ নিশ্বাসে।

টিয়া-টিলায় কতকালের ছায়া,
উপত্যকা চুড়োর মুখোমুখি—
ঐখেনে, কাল ঝকমকে রোদ হ'লে
শতদ্রুর উঁকি॥

তোমাকে আমি

তোমাকে আমি বল'তে চেয়েছিলাম
জীবন নয় নদীর কোনো নাম
জীবন নয় পাহাড় থেকে এসে
দুঃখ পাওয়া আঘাতে-আশ্লেষে,
জীবন মানে আরো —

সোনাল ফুল রাত্রিবেলা ঝরে,
সকালবেলা তুমি আমার ঘরে ;
তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় জীবনসংগ্রাম ।।

দায়

চোখ নেই তেমন আকাশে—
তোমাকে ছুঁয়েই সব শান্ত হ'য়ে আছে,
প্রপিতামহের কণ্ঠ আমার গলায়
সেও কি তোমায় ভালোবেসে !

যেতে হ'লে, ঢের দূরে যেতে হয়
অদ্ভুত কুঠুরি ঘর অলীক অচেনা,
নেহাত আলস্য নয় আমার বিনয়
বস্তুত, তুমি এক দেনা !

না হ'লে, লাফানো যেত আকাশ কি পাহাড় ছাড়িয়ে
কর্কশ, করুণ মাটি রাত্রে ভিজে-ভিজে···
কিন্তু যে কোনো মৃত্যু স্পষ্ট স্মরণীয়
বিশেষত, রোমাঞ্চ সিরিজে ;

দৃশ্যছবিগন্ধময় প্রণয়ীবহুল জনপদে
ভেবেছি কখন যাবো হাওয়া, কিংবা নেতার দাপটে—
কিন্তু ততোবার তুমি বাধা দাও ত্রস্ত পদে-পদে
পুরনো চাবির রিং, হায়, বেজে ওঠে ।।

পাতানো বোন

রক্ত ছুঁয়ে যে যায়, ফিরে আসে
পাতানো বোন, তোমার কথা আনে
তোমার কথা অন্ধকারে ঘাসে
বিন্দুনিময় দিনের অনুমানে।

বৃষ্টি এলে জারুল কথা রাখে
আকাশ ঝরে, এমনই মৌসুমি—
সবই তোমার পরে, আমার ফাঁকে,
তুলির শেষ টানের মতো তুমি।

ঘুমিয়ে থাকো কোথায়, আমি জানি,
জেগে উঠেই রাঙাও অবসরে,
পাতানো বোন, পাড়ার কানাকানি
অবহেলায় লুটিয়ে পড়ে ঘরে॥

চোখের আলো

এখন ভুলেছি তোমার চোখের আলো
রাত বাড়ে, শুধু বিরক্ত রাত বাড়ে
যেন, প্রাণান্ত স্মৃতিময় সংসারে
শব ছুঁড়ে দেয় ভারবাহী চণ্ডালও।

ভীরু বালিকার ঘোরলাগা খেলাভুমি,
একদা সয়েছো উথাল স্রোতের বাহু,
নন্দিতা, তবু রক্তকিনী দেহ মনে
উজ্জ্বলতায় রঙ দিয়েছিলে তুমি।

এখন কোথায় তোমার চোখের আলো।
আকাশ পাথর সময়ের গুরুভারে।
যে আমি এখন নির্জন পথ হাঁটি
তারও ঘর ছিল তোমার চোখের আলো॥

মরিয়ম

ঘুমন্ত ঘণ্টা, মরিয়ম,
তোমার দেহ ছিলো।
টানাপোড়েন সুজনি-মশারিতে
নকশা কী উড়ছিলো।

বরফ ছিলো বাইরে, মরিয়ম,
তুমি আমার ছিলে—
রাত কাটাতে এলো আমার দেহ,
হৃদয় কেন এলো!

কাঁদলো কে! শব্দ, মরিয়ম,
আমার ভয় করে;
ঝরলো রং, আহা, তোমার রং
হৃদয় কেন এলো ॥

অপেক্ষা

একটা কথা আমায় জানতে হবে
ওরা আমায় পাহাড় থেকে
গড়িয়ে ঠেলে দিলো কেন?
ঠেলে যদি দিলোই, তবে হাওয়াও কেন অমন মৃদু ভ্রমর,
ঘুরে ঘুরে, মাগো, আমায় ঘিরে ঘিরে
সুরের মত ওড়ে।

নইলে, ঐ পূর্বপুরুষ সাতটি তারার চোখে ঢ'লে
ঘুমের ছলে আমায় ডেকেছিলেন; তবু, সেদিন
যাইনি, আমায় জেনে নিতে হবেই ব'লে—
কেন ওরা পাহাড় থেকে, পাহাড়তলির বাড়ি থেকে
আমায় অমন অতর্কিতে ঠেলে দিলো।

একটা কথা আমায় জানতে হবে।
দু-তিনটে লোক অমন ক'রে তাকায় কেন ভিড়ে,

কেমন করে জানে আমার রক্তে কোনো আগুন
আছে কিনা—

পরখ ক'রে দেখতে যদি ভালো লাগে
ওরা আমার পাঁজর ছেড়ে, আমার পথের ধুলো ছুঁয়ে
অট্টহাসি ক'রে উঠলো কেন—
একটা কথা আমায় জানতে হবে।

বুকে অনেক দুঃখ কিন্তু আমার কথা বলিনি—
ধূর্ত চোখে ছোরা জ্বলবে ভেবে এখন রাত্রে বসে আছি
মরে যেতে-যেতেও দেখবো, কোনো নদীর জলে এসে
ওদের ছায়া লজ্জা হ'য়ে কাঁপে কিনা—
লুটোয় কিনা কোনো নদীর বিশাল নীল ছায়া।

একটা কথা আমায় জানতে হবে,
কেমন ক'রে জানে ওরা, এখানে শেষ, ওখানে তার শুরু
কোনো ঘরের দেওয়াল বেয়ে লতা উঠছে কিনা—

একটা কথা আমায় জানতে হবে ॥

একটি ভবিষ্যৎ বাণী

প্রচন্ড ব্যাথায় তার মুখ ফুলে যাবে
গণক, ডাক্তার এসে হদিশ পাবে না,
হয়তো মৃত্যু হবে, বৌকে হারাবে,
পাঁচটা লোকের মতো শুধবে না দেনা।

'সেলাম ঈশ্বর' ব'লে হাঁক দিয়ে গেলে
চুন, কি সিমেন্ট খসে সীলিং কাঁপিয়ে।
মূর্খ ! কোথাও তাঁকে এইভাবে মেলে—
সময় বিফল হ'লে, প্রাণ সামলিয়ে

কোথাও পাঠিয়ে দেবে নিজের বোঝাকে—
দুচোখে ব্যস্ত কীট, বুকভরা ক্রিমি,
মেঘের নকশা, হায়, ডেকেছিলো যাকে,
তাকেই দাওয়াই দেবে ঘুমের হাকিমি ॥

রূপক

স্বাস্থ্য, সুখ, হঠাৎ গেলো ভেসে—
জলের দরে বিকিয়ে দিলো বাড়ি,
কারণ শুধু অলীক পায়াভারি
সময়মতো নাচেনি রায়বেঁশে।

টাঙানো মাঠ, ধোঁয়ার মতো বাসা,
নিজেই রাখে ছবিটা উল্টিয়ে,
শব্দ হ'লে, কানে আঙুল দিয়ে
ভুলতে চায় ভাষা;

উপায় নেই, তেমন পেটা-ঘড়ি
অনেক থাকে, চমকটুক দিতে—
লোকটা তবু হিসেব বুঝে নিতে
তোমার কাছে যাবে না, সুন্দরী।

ঘটনার জন্য

কিছু একটা হোক; সেই তিনটে থেকে ঠায় বসে আছি।
চ্যাপলিন দেখান ভেল্কি সিনেমার বাইরে, খোলামাঠে;
বন্ধুটি করুক বিয়ে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি;
নইলে, চাকরি নেই, সারাদিন কার নামে কাটে!
বাইরে যে কিছু নেই, সেকথাও রক্ত দিয়ে জানি,
কিন্তু সেভাবে
কোথায় কী থাকে? এই পাঁচটা পঁচিশে
তোমার ভিতরে কোনো দেবদূত বসে আছে, ভাবো।
পার্কের ওপারে আলো, সেকি শুধু পার্কের গাছের
কোনো ভোজবাজি? তুমি গিয়ে কাচের গেলাসে
কাত ক'রে তুলে নেবে? তিনটে আঙুলে
ব'লবে: এখানে আছে, এখানে, এখানে—
কিন্তু যদি কাছে যাও ভুলে!
অঁরি মিশো লিখেছেন, যে কোনো নতুন লোক দেখে
হাত-পা-সমস্ত মুখে ঝাঁপ দিয়ে চিনে নিতে হয়,
তাহ'লে, দৈবাৎ যদি, রাগ ক'রে নিবিড়তা শেখে
ফরাসীদেশের রাণী বলেছেন তাঁর ভাইপোকে

'আমার আয়নাটা ভাঙো, অন্তত শব্দ হোক কিছু—
এইভাবে বলেছে অনেকে।
আমি কাকে বলি ?
সমস্ত বিকেল জুড়ে অন্ধকার বৃষ্টি নেমে আসে
কিছু একটা হোক, মনে হয়
যারা প্রেম করে, তারা কিভাবে কোথায়
প্রেম করে ?   তারা যদি হাওয়ায় হাওয়ায়
কৃতকর্মের কোনো জের রেখে দিতো, তারা যদি
স্পষ্ট কোনো ফুল, ফল হ'তো ?
তারা কিভাবে কোথায় প্রেম করে ?
নইলে, সমস্ত রাত এপাশ ওপাশ ক'রে
কার দেখা পাবে ?   ঠিক দুঃখ নয়, আমি তার মূর্তিরূপ
দেখেছি জীবনে ;   যন্ত্রণা বুঝেছি আমি
লক্ষ লক্ষ কবিতায়, গানে ;
কিন্তু এই কিম্ভুত, মলিন
বিনিদ্র রোগের কোনো নাম নেই—
যদি কিছু হয় ?   বৃষ্টি, ঝড়, অথবা হাওয়ায়
কোনো মুখ জেগে ওঠে।   যদি একবার
প্রথম পড়ন্ত রোদে সে আসে ছায়ায়—
যদি কিছু হয়।

পনেরো বছর পরের জন্য

কে কীরকম বেঁচে আছে, জানতে ইচ্ছে করে।
যে-তিনটে লোক সাফল্যের কুড়োল হাতে নিয়ে
শব্দ ক'রে বন কাটতো, তারা এখন কোথায়—
একজন তো রীতিমতো সাজানো সংসারী
গোবরডাঙ্গায় বাড়ি উঠছে মাঝারি দেড়তলা,
অন্য দুজন অঙ্ক কষতে পেরেও যেন দশমিকের ভুলে
শেষের ধাপের করুণ কাটাকুটি।

কিন্তু আমার ব্যঙ্গ করার কী অধিকার আছে ?
আমি বরং কৃতজ্ঞ যে, আঘাত দিতে এসেও ক্রমাগত

ওরা আমায় অন্য কিছু জুগিয়ে এসেছিলো ;
আমি ওদের শাদা কি নীল রঙে
ভাগ করতে জেনেছিলাম, শাদা কি নীল রঙে
কত ইতর দুর্ঘটনা আমার হাতে সুশ্রী হ'লো, ভাবো !

এখন আমি যে-ঘরে যাই, তারও নিজের জয়পতাকা নেই
কেউ ভাবে না, মিহিজামের মহারাজা থাকেন—
কিন্তু আমি অন্ধকারে যে-অবিরল বৃষ্টি শুনে ফিরি
তাকে, আমার রক্ত ছাড়া, অন্য কোথায় হিসেব দিতে হবে !

'কিছু পেলাম', এই কথাটা জানতে আর এখন
কোনো মেয়ের কাছে গিয়ে বাচাল হ'তে হয় না নিয়মিত
শুধু যারা নানাভাবে আমার জীবন ব্যস্ত রেখেছিলো
তাদের আমার দেখতে ইচ্ছে করে ।

শীত

তুমি কি কাঁদবে আজ সন্ধেবেলা পাতা ঝ'রে গেলে
শীত, বড় শীত, এই অন্ধকার ঘরের ভেতরে
কাচের দেয়াল ঘেঁষে চোখ রাখা যায় না বিকেলে ।

এখন তো পাতা ঝরে, একদিন বিকেলের গলি
যখন গাছের ছিলো, দ্যাখোনি কি, ধুলোয় না ঝ'রে
চতুর পাখির মতো উড়ে গেছে পাতার রুপোলি ॥

অন্তরঙ্গ

খুব সমুদ্রের শরীরে কিছু হয়,
দুহাত মেলা যায়, সাঁতারে, সমীরণে,
ডুবুরি নই, তবু ভীরুও নই যেন
ধরণধারণে,
তোমরা আসছো কি ? আমার বিফলতা
যাচ্ছে, স'রে যায় সমুদ্রের বনে,
ডুবছি, ভাসছিও, পায়ের দুইপাতা
মিলছে বিজনে,

খুব সমুদ্রের বুকের কাছে হয়—
যে কোনো মাছ যায় চন্দ্রালোকে চিনি,
কিছুই ছোটো নেই কিছুই ভুল নয়

জীবন সঙ্গিনী ॥

মানুষ,

ভাঙা-ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়,
মানুষ কাঁপছে ;
একটা হাত পাশের মানুষীকে
ধ'রে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে—বুঝতে পারছে না,
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে ।

সামনে শুধু রুদ্র এক পাহাড়
সামনে এক প্রচণ্ড ঝামরানো
সমুদ্রের ক্লান্ত অন্ধকার ।

আড়াল ক'রে দেখে নেবার মতো
কোথাও আর গোপন দৃশ্য নেই ;

মস্ত একটা হাওয়ায়, ভাঙাঘরে,
মানুষ কাঁপছে ॥

একটি মৃত পাখি

পাখি মরে আছে,
পাখি বরফের স্তূপের ভেতরে মরে আছে ।
ছিলো কি কোথাও আগে ? বাসা বেঁধেছিলো
পোড়ো জমিটার নীল গাছে ?
নাকি হাওয়ার ফিকিরে, ঘুরে-ফিরে,
এসে মরে গেলো এই দু'নম্বর বাড়ির শিবিরে ?

মাথা গুঁজে আছে,
যেন বরফের ভেতরের ঘর
সিঁদ কাটতে চায় ; যেন ব্যালেরিনা,
ভার পালটাতে গিয়ে আস্তে থেমে আছে—
ঘুরে গিয়ে, এক ঝাপ্‌টায়
আবার ভরাবে শূন্য শব্দময় রঙিন ডানায় ।

কিন্তু বড় দেরি হ'য়ে গেছে, মনে হয় ।
কিছু আগে ঈশ্বরের শেষ ক্ষমা ক'রবার সাধ
মিটে গেছে । আজ শুধু শীতের আলোর
ধবল নিঃসঙ্গ পাল
মেঘ-ছিন্ন, জলে পড়ে আছে,

পাখি মরে আছে,
পাখি শীতের ভেতরে মরে আছে ॥

তৃষ্ণার ভেতর থেকে

তৃষ্ণার ভেতর থেকে পাখি উঠে আসে ।
হে ঝর্ণা আমার,
প্রতিটি শব্দকে তুমি সদ্যোজাত শিশুর মতন
দোলাও দুহাতে, তুমি প্রতিটি পাহাড়
প্রতিধ্বনি দিয়ে ভাঙো, নাম ধ'রে ডাকো —
যেন এইমাত্র চড়ুইভাতির
বন্ধুরা চলেছে ফিরে ভ্রমররঙিন কোনো গ্রামের ভেতরে ;

তৃষ্ণার ভেতর থেকে পাখি উঠে আসে ।
আমি স্পষ্ট দেখি, আর ভাবি ঃ
কত দিব্যদেহ ধরে
অনুপম বীথির শরীর ; কত রং ঝরে
বালার্কবিস্তৃতে এই আলোর শহরে ।
হে ঝর্ণা আমার,
তোমার তৃষ্ণার ছলে পাখি ওড়ে আমার আকাশে ॥

প্রেমিকাকে

(১)

সমস্ত ঝর্নার জলে
তুমি কিরকম যেন চাবি ঘুরিয়েছো,
মাঝে মাঝে থেমে যায়,
আবার ঝর্ঝরস্বরে পাথরে গড়ায় ;
জল খ'সে পড়ে।
তুমি কি কিছুই আর
সহজ অংক দিয়ে
পারবে বোঝাতে। বুকের ভেতরে
কেন দাগ পড়ে। বুকের ভেতরে
কে রাধা, কে কৃষ্ণ হবে
এই নিয়ে গোলযোগ বাড়ে,
আমার ঝর্ণার জলে, তোমার
হাতের বোনা তাঁত বেজে ওঠে।

তুমি কি পারবে সব জড়ো ক'রে দিতে।
আমার অনেক আছে ; আমার নিজেরই
ঠিক জানা নেই, কোথায় কি আছে।
শুধু ডাক দাও, যাই,
আম-কুড়োনোর ছলে আমার নিজের জমি
উথাল পাথাল ক'রে টাল খেয়ে আসি।
তুমি যে হান্‌ছো ঝড়
পরে সব গুছিয়ে দেবে তো,
নাকি সকল গানের কল
নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
তবু খেপিয়ে বেড়াবে!

আমি তো নিজেও কিছু
বুঝতে পারি না।
শুধু বুকের ভেতরে

কে যেন একান্তভাবে খেলে যায়।

শুধু বুকের ভেতরে
দুদিন তিনদিন, যেন
সমস্ত জীবন ধ'রে জড়ো হ'তে থাকে

(২)

সমস্ত নিয়ম তুমি জলে ধুয়ে দাও
তুমি সমস্ত নিয়ম
পোকার-খিদেয়-কাটা অর্ধেক ফলের মতো
ব্যবহার করো।
কিছু ফেলে দাও, আর বাকিটুকু
জলে সাফ্ করো,
জলে সাফ্ করো।

(৩)

আমি একদিন খুব শব্দ ক'রে উঠতে পেরেছি।
আমি একদিন
তোমার বাড়ির পাশে
মাতাল ইয়ার নিয়ে আড্ডা মেরেছি।
আমি একদিন
তোমার আয়নার কাচ
আমার কৌতুক দিয়ে ভাঙতে চেয়েছি,
তবু কখনও পারিনি।
আজ কী রকম সব
ভেঙেচুরে শেষ হ'য়ে গেছে।
সবুজ ঢালুর পাশে
আমি কি ওখানে ?
তুমি ঘরে নেই, তুমি শুধু
হাততালি দিয়ে
হাজার হাজার সব পাখিদের
ছিটিয়ে দিয়েছো।
আমি চুপ ক'রে কাকে যেন দেখছি।
আমি চুপ ক'রে
তোমার বিজন স্তনে
মুখ রেখে কাঁপছি, প্রেমিকা॥

(৪)

বেড়ে উঠছো—যেন তুমি মস্ত বড়ো গাছ,
নাকি মানুষের ইট-কংক্রিটের তৈরি
ব্যস্ত পাঁচতলা,
বেড়ে উঠছো, ভয়ংকর বেড়ে উঠছো, তুমি
আমাকে সামলাবে ব'লে
নিউ ইয়র্কের মতো বেড়ে উঠছো, প্রেমিকা।

আমি কী ক'রে তোমায় নিয়ে ঘর করি!
আমি বিষণ্ণ-জমির সব অন্ধকার-তাতানো ইঁদুর নিয়ে
কাছে আসতে চাই, আমি আমার বুকের সব পতঙ্গ-মাকড়
নিয়ে ভালোবাসতে চাই, আর তুমি
ধাবমান, ক্রমবর্ধমান
প্রচণ্ড নদীর মতো পালিয়ে চলেছো,
আমার মুঠোর বাধা টুকরো ক'রে সরিয়ে, কখনও
স্বাধীন স্রোতের মতো ঝ'রে পড়ছো;
আর যতো চলছো ফিরছো, যত বড়ো হচ্ছো,
অবসানহীন যত আকাশ-সটান আলো
ঝামরে চলেছো···
আমি ততবার ভয়ে কাঁপছি, আমার
খুদ-কুড়োনোর-হাতে মস্ত-মস্ত স্বাদ
ঠেকে যাচ্ছে, আমার
বুকের প্রত্যেকটা হাড় বাজছে, আমাকে
এমন অদ্ভুতভাবে
কেন ভালোবাসছো, প্রেমিকা।

চলমান

আমি জীবনের সঙ্গে
খুব টেনে বাঁধছি, এখন
তুমিও আমার খেলা
বুঝে নিতে পারো।

ছেলেরা চলেছে, দ্যাখো,
সকালবেলার রৌদ্র চোখে নিয়ে
সময় চলেছে।
যে কৃশ-শরীর গাছ উঠানে বেড়েছে
তার ঠাম বুঝতে পারো কি ?
দুই স্তন হাতে নিয়ে, দুই স্তন হাতে নিয়ে
উঠোন পারের ঐ মেয়েটি যে
একলা দাঁড়ালো,
তারও বুকের সমস্ত দাপ খেলতে জেনেছে·
টুকে নাও, টুকে নাও, সমস্ত রৌদ্র নিয়ে
সমস্ত প্রেমিক নিয়ে
সময় চলেছে,
আর আমিও চলেছি ॥

ফরাসডাঙ্গা

আজ বুঝতে পাই
তুমি একটি মৃদুল হাতে
গ্রহতারাদের কেন স্নিগ্ধ ক'রে দাও,
হলুদ পাতার ভিড় ঠেলে নিয়ে যাও
কেন অব্যর্থ হাওয়ায়,
আজ বুঝতে পাই।

এত সীমাহীন বাড়ি যে পেতেছো
তার খাজনা কে নেবে ?
আমার তো, জানো, এই বিষয়আশয়
খুব বিশেষ আসে না।
আমি যদি কাণ্ডজ্ঞানহীন কোনো কাজ ক'রে বসি !
এত নীলঘর, এত ট্রেনের-লাইন-ঘেরা
ঝংকৃত নিখিল, আমি যদি
বকেয়া আদায় ভুলে স্রেফ বেঁচে থাকি,
ফটিক জলের পাখি তাড়াতে-তাড়াতে
নিজেই মেঘের কাছে হাত পেতে রাখি।

বরং তুমিই সব কাজ করো, আমি কাছে রই,
তুমিই মাচার সঙ্গে ফুলগুলি ক'ষে বেঁধে দাও
উঠোন নিকিয়ে সব পাড়ার সজ্জন এনে
খুব খাইয়ে দাও ; তুমি সদারঙ্গময়
কীর্তনের দল খুলে বসো ;
তুমি সময় বিকেল
খেতের পাশের কোনো ঢিপি থেকে সূর্যডোবা দ্যাখো,
সমস্ত ধোপারা যেই কাপড় আছড়াতে হাত তুলেছে, ওপরে
তুমি বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে অন্য-কিছু হাতে গুঁজে দাও,
খুব শব্দ ক'রে কোনো জ্যোৎস্নার প্রপাত এসে
পড়ুক পাথরে।
সব সাফ্ হ'য়ে যাক।

আজ বুঝতে পাই
তুমি যেন মৃত্যুবহতার
নদীটিকে জলে ভ'রে রাখো।
তুমি সর্বাঙ্গ ক্ষালন ছাড়া বাঁচতে পারো না
শুধু মাজো, ঘষো, আর
প্রতিটি উজ্জ্বল অঙ্গ আমাকে দেখাও।
আমি আজ দেখতে পাই

তিনজন নিঃস্বপ্ন লোক থমকে দাঁড়ালো

হয়তো স্বপ্নে কিছু ভুল-ছিলো,
কিংবা কখনও
হয়তো স্বপ্নই ওরা দ্যাখেনি,
না-দেখে
বিকেল-বিকেল এই রাস্তায়
থমকে পড়েছে,
এ ওকে দুষছে, বকছে,
এক সঞ্চিত অসুখ
ভাগ ক'রে নিতে গিয়ে
ভাগে মিলছে না।

গ্রাম ছিলো, দীর্ঘায়ত গ্রাম,
সাঁকো পেরুলেই এক প্রকাণ্ড শহর
সব দেখেছিলো, কিন্তু কিছুই দেখেনি
না-দেখে না-দেখে স্বপ্ন
গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত-শরৎ
না-দেখে না-দেখে স্বপ্ন
ওরা নিজেদের আর
ভালোবাসতে পারছে না,

বিকেল-বিকেল
এই রক্তের মতন রোদে
হুল, পাখা, সব আটকিয়ে
এপার ওপার,
কিংবা বিস্তৃত কোথাও
আর যেতে পারছে না।

অসমাপ্ত

একবার উঠেছিলো, তবু মাঝপথে
যেন থেমেছে করাত,
শুধু গুঁড়ো প'ড়ে আছে।

অর্ধেক খেলার পরে সমস্ত পুতুল গেছে
উঠোন পেরিয়ে;
অর্ধেক প্রেমের পর
রোদ প'ড়ে এসেছে শরীরে,
অর্ধেক ঘুমের পর
তুমি চ'লে গেছো।
তবে কি নিবিড় ব'লে কিছু নেই? সংহতি? না কি চিরদিন
এভাবে আড়াল থেকে বাধা আসে।
দুশো কি তিনশো লোক কথা বলে; তিনশো রমণী—
শুধু মেঘ ক'রে এলে
ভুঁই-পিঁপড়ের মতো
দোর-দালানের দিকে চ'লে যেতে শেখে।

একবার ঘটে যেন। ভালোবাসা নামে যে আকাশ······
না কি বালকের দল একদণ্ডে এসেছে বাগানে!
অথবা পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে
টিটিভ পাখির ডাক ভেসে চ'লে গেছে
তুমি শুরু ক'রে দিয়ে
চ'লে গেছো ব'লে
আমি আঁধারে রয়েছি। আমি

অর্ধেক প্রেমিক।

বাড়ির বিষয়ে

বাড়ির বিষয়ে
আমি খুব কম জানি।
আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই,
অথবা যা আছে
তাকে তিমির পেটের মধ্যে
চলমান অন্ধকার মনে হয়।
আমার বন্ধুরা খুব বড়োলোক নয়,
তারা পায়রার খোপের মতো
সাময়িক রন্ধ্রে বাস করে।
আমাদের দেখা হয়
সমবায় শখের চাতালে।
যাঁদের অনেক বড়ো বাড়ি আছে
তাঁরা আমাদের কিছু খেতে দেন
তাঁরা অদৃশ্য আঙুল থেকে
করুণা ছড়ান।

বাড়ির বিষয়ে আমি এত কম জানি
যে-কোনো বৃষ্টি এলে
আমার স্বদেশে ঝরে, টের পাই,
আমি ছত্রহীন কোন অনিবারণীয়
হাভাতে নেশার ঘোরে
ভিজে সার হই।

সমস্ত কুকুর ভেজে, বাড়ি ভেজে,
নক্ষত্রবিহীন কোনো চতুষ্কোণ নীরবতা ভেজে,
আমার শরীর ছেড়ে, হৃদয় আদুল হ'য়ে
বাদল পোহায়।

বাড়ির বিষয়ে এত কম জানি,
দু'দণ্ড কোথাও টিঁকলে, মনে হয়
ঘর পেয়ে গেছি।
মনে হয়' তুমি কোনো বিশেষ অভয় দিয়ে
পৃথিবী গড়েছো। মনে হয় বন্ধুদের সব হৈচৈ
ছাত পেটানোর শব্দ। যেন চিরকাল
নারকোল গাছের পাশে দাদুর দেখানো ইটখোলা
বড়ো বড়ো ইঁট শুধ আমার বাড়ির জন্যে
পাঠিয়ে চলেছে।
বাড়ির বিষয়ে আমি এত কম জানি।

এ-বিষয়ে তুমি কিছু ভাবো,
আমি চাই,
তুমি বেহালায় গিয়ে বাড়ি দেখে এসো,
তুমি গ্রানাদায় কিছু জমি কিনে রাখো,
পরে বাগান বানাবো।
তুমি আতুর সন্ততি নিয়ে
কোনো শিবির বসাও। আমি বক্তৃতা দেবার ছলে
কিছুদিন শরীর সারিয়ে এসে
কাজে মন দেবো,
অথবা, নিজেই কোন ঝলমল্ বাগানবাড়ির মতো
পল্লবিত হও। আমি নদীর দিকের রাস্তা
বেছে নেবো। আমি কোনো চড়ুইভাতির
সমস্ত উনান, গান, টিফিন বাক্স নিয়ে
বজরা ভেড়াবো।
বাড়ির বিষয়ে আমি বিশেষ জানি না,
আমার নিজের কোন বাড়ি নেই,
এক যদি তোমার ভেতরে গিয়ে
ঘর নিতে পারি.

তুমি যদি নবজায়মান
গৃহপ্রবেশের মতো পত্রালি সাজাও,
তুমি যদি সন্নত আঁখির
কোনো দোর মেলে ধরো,
তাহ লে, আবার হয়তো থেকে যেতে পারি।
এ-ছাড়া আমার কোন বাড়ি নেই,
ভালোবাসা নেই।

বাড়ির বিষয়ে আমি
খুব কম জানি।

একটি প্রেমের কবিতা

দেখা হ'লো, কিন্তু যেন জলের ভেতরে
দেখা হ'লো ; তুমি স্থির ভাসলে অকূলে ;
আমি স্পর্শপ্রিয়, তাই আস্তে ধ'রে···ধ'রে···ধ'রে
বুঝতে চাইলাম প্রেম ওষ্ঠে, স্তনে, ব্যগ্র বাহুমূলে।

তবু কি স্পষ্ট কিছু দেখা গেলো ! কখনও এভাবে
তোমাকে আলাদা ক'রে দেখা যায় ? শুধু 'চলো, চলো
শব্দ হ'লো ; বিদ্যুৎবাহিনী জল ছড়ালো স্বভাবে ;
শুধু জোনাকির ফুল ফুটে ঝ'রে গেলো॥

লণ্ঠনপ্রমাণ আলো

সব শান্ত হ'য়ে এলে,
আদুড় হাত-পা নিয়ে কিছু লোক
ব'সে থাকবে।
একে -একে, পশ্চিমের হাওয়া খেয়ে এসে,
ফিরবে প্রবাসী ;
দুপুর গড়াবে।

এর বেশি অভিজ্ঞতা নয়।

এর বেশি অভিজ্ঞতা নেই—
শিমলতাটার পাশে সূর্য, প্রায় মোমের মতন নিভে এলো,
বাইসাইকেলে সব ফিরলো ছেলেরা।
বেশি হাওয়া নেই ব'লে, খুব বেশি শব্দ কাছে নেই'
সহজ হাত-পা আছে, সবাই সবার কাছে
ব'সে আছে। কারা যেন গান গেয়ে
ঢুকছে গলিতে।
দ্যাখো,
লণ্ঠনপ্রমাণ আলো নামছে উঠানে,
লণ্ঠনপ্রমাণ আলো
সমস্ত কাঁপিয়ে, নিজে স্থির হয়ে আছে॥

পোকার মতো

পোকাগুলো ভাম হ'য়ে, জলের ভেতরে
চলে গেছে।
বৃষ্টি প'ড়লে, আর
পতংগ-প্রাণীর শ্বাস
শুনতে পাবো না;

আমিও পোকার মতো রাগ ক'রে
ঘরে চলে যাবো।

এই সেই জায়গা

এই সেই জায়গা
যেখানে
'বেঁচে থাকবো, সুখে থাকবো' ব'লে
খুব তাড়াহুড়ো চলে সকাল বিকেল, খুব তাড়াহুড়ো

কোথায় কিভাবে যেন ঘটে যায়,
কোথায় কিভাবে

মানুষের পাশ থেকে স'রে যায় সঠিক মানুষী,
ভাষা না শেখার জন্য, ভাষা না জানার জন্য
শুধু ভাসাভাসা

চলেছে সকলেই, তবু কেন চলে……না হ'লে কী ক্ষতি,
এই সেই জায়গা
যেখানে
বোবা কামানের মতো গাছপালা
সলতের অভাবে নিবু নিবু ;
পার্কে ছাতা হেঁটে যায়, মানুষ-আড়াল-করা,
অথবা মানুষ
আলস্যবশত আর আসত পারে নি—
শুধু নিয়ম চলেছে,

এই সেই জায়গা
তাহ'লে ?

আঁধি

যা-ই দেখতে চাই, তার ভেতর দিকটা পুরো নজরে আসে না।
বায়নাকুলারে দোষ ? নাকি দোষ বস্তুর আড়ালে, ঘটনায় ?
অথবা কোথাও কারো ত্রুটি নেই, শুধু যোগসাজসের অনটন,
মঙ্গলগ্রহের চেয়ে স্পষ্ট নয় তোমাদের মুখের মাধুরি।

তবে কি অপেক্ষা করবো ? ঘুরে যাবো শৈশবের দিকে ?
সাইকেল হাঁটিয়ে নেবো অবিরল অড়হর ক্ষেতে ?
যা-ই ছুঁতে চাই, তার ভেতর দিকটা তবু আঙুলে ওঠে না—
হাওয়া, দিকচিহ্নহীন হাওয়া, শুধু হাওয়া
দেহের উপরে ॥

অন্যভাবে নয়

কিছু হয় নি, কথার ভারে থেমে আছে,
দুলিয়ে দাও, তাকে করো দ্রাক্ষালতা,
তাকে ফোটাও অন্ধকারে আঁকাবাঁকা
মাঠের ওপর প্রতীক্ষিত সিসুগাছে—
কিছু হয়নি, আপাতত কিছু হয় নি।

ওরা ভীষণ কথা বলে, ওরা কারা ?
কিছু হয় নি, আকাশ-ভরা তারা জানে,
প্রেমিক দেখে প্রেমিকাটির ভীরু চোখে
ত্বরান্বিত, গাঢ় আয়না—
কিছু হয় না, অন্যভাবে কিছু হয় না।

কিভাবে, কোথায়

কিভাবে কিভাবে হবে ? যা হ'য়ে চলেছে, তারো পরে
কিছু অসমান কাজ ছেঁড়া-পোস্টারের মতো লুটায় দেয়ালে,
খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে আসে নিমগ্ন যুবক—
এখন কোথায় কাজ শুরু হবে ? এই গোলমালে
কিছু কি শান্তভাবে করা যায় ? অথচ এখুনি
আঙুরলতার মতো উঠে আসে আচ্ছন্ন সময়,
আধো-কুয়াশায় দিকে চলে যায় মানুষ-মানুষী ;
বেঁচে থাকবার কাজ এগিয়ে পিছিয়ে একঠায়

এখন স্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেছে। যদি না কখনো
সরল জলের মতো জেগে ওঠে আরব্ধ হৃদয়
তাহলে কেমন ক'রে খেলা হবে ? কিভাবে, কোথায়
এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষ যাবে পথের ওপরে ?

একটি আঙ্গিক চাই

একটি আঙ্গিক চাই—
যেখানে ক্ষেতের মতো সব জেগে আছে,
বনান্তরাল থেকে চড়ুইভাতির বাস এসেছে উজিয়ে,
জলের ভেতরে, দ্যাখো, ট'লে যায়
সূর্য ও তরঙ্গ, দ্যাখো তারা···
একটি আঙ্গিক চাই—
যেখানে মধ্য থেকে শুরু হয়
আদিগন্ত, কাল নিরবধি।
জড়তা হারাবো ব'লে
কাঠখড় জ্বালিয়ে নেবো কি ? তাতে
কিছুই কি ঘটে ?
এখন সহজ কিছু খেলা চাই, স্বাভাবিক, ডিরেক্ট-ডায়ালে কথা বলা
যে যেভাবে আছো, এসো, পূষা ও গোতমী,
এসো, আমার সরমা

একটি আঙ্গিক চাই
সবুজ ঢালুর মুখে ডাকটিকিটের মতো
লাগানো হরিণী
যেখানে বাংলোর ছাত উড়ে যায় শতভিষা ছাড়িয়ে আকাশে,
মৃদু গুম্ খুন ব'লে মনে হয় মর্মর-ছড়ানো অবসর ;
পাহাড়ে উঠবার আগে হাঁটু পায় শোভন লঘুতা ;
কে পারে পতাকা নিয়ে ফেলে দিতে—
আপাতত সমস্ত সময়
বাঁকা-মাঠ প'ড়ে আছে। চড়ুইভাতির বাসে বেজে ওঠে
হর্ণ॥

জ্যোছ্নায় এক টুকরো ফল ও একটি শিশু

এক টুকরো ফল আজো মুখে স্বাদ আনে—এই রহস্য !   বাগানে
ডাঙা-চাঁদ যতু ভালোবাসে তার ডানা নেই নাহ'লে উপরে
কিছুটা নিশ্চিত যেতো মানুষও তো অংশত খেচর, ডানা নেই,
যতুর মতন এতো উড়ুক্কু বালকের ডানা নেই কেন—তাও রহস্য, এখানে

নাসপাতি খাওয়া যায়, খাস চন্দ্রভাগা থেকে উড়ে আসে মরাল বাহিনী।
এতো প্রাণময় এতো অন্ন-ঘ্রাণ পুলকে নিবিড় অবিরল···
ট্রেন ধেয়ে আসে যেন বায়নাকুলারে এক নাচের গোড়ালি, স'রে যায়,
এক টুকরো ফল যদি ভাল না লাগতো, তবে কখনো এভাবে

যতু ও যতুর জন্যে জেগে-ওঠা ভাঙা-চাঁদ, তৈরি হ'তো না ॥

মার্চ-এপ্রিল

হাওয়া কুচকাওয়াজ করে—
মথিত মার্চের তৃণ ট'লে পড়ে জলে ।
এইসব দৃশ্য জাগে কাঁটাতার টপকিয়ে পুরনো শহরে—
নিসর্গ নিয়েছে তবে এক মিনিটের জন্যে সমস্ত দখলে ।

হাওয়া ফিরে আসে, আর এপ্রিল ছাপিয়ে জাগে নতুন রেডিয়ো
হাতে-হাত ওরা হাঁটে, কবুতর ছড়ানো পাষাণে !

ফলতা ডাকবাংলো

কোথাও ছিলো না কিছু হৃদবিদারণ ঘটে যায়
শিমুল, উর্ধ্বগ তুলা, অথবা নাচুনে মাছ জলের ভেতরে,
কোথাও থাকে না কিছু হাওয়া তা-ই নিঃশব্দে নাচায়,
সোজাসুজি চ'লে আসে ছিপ-নৌকোর মতো অমোঘ মানুষী-

ফলতা, বা চাবেরিয়া, কলকাতা, যেখানে সেখানে ॥

কাছে

কাছে, খুব কাছে আসতে দিই।
কোনো ব্যবধান, কোনো বিচ্ছেদ, আড়াল
যেন কোথাও না থাকে।
লণ্ঠন উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে : উঠোন আঁধার ;
কাছে আসতে দিই—

বাংলাদেশ

(১)

চুপ ক'রে থাকা যায় না ; একবার কথা বলতে হয়।
কাঁধে যে পাথর আছে—সেই কথা বলা হয়েছে কি ?
চোখে যে কুয়াশা নামে—সে বিষয় ?
না হ'লে কিছুই হয় না, কিছু নয়, মনগড়া ফাঁকি—
হাতে ঠেকে যায় হাত, সেই হাত কবিতা লেখে না,
বাসের হাতলে লেগে ছিঁড়ে ছিটকে দুমড়ে স'রে যায়,
চুপ ক'রে থাকা নয়, এইবার কথা ব'লতে হবে

(২)

"তুমি হও গহীন গাং, আমি ডুইবা মরি"
মৈমনসিং গীতি থেকে স'রে স'রে হাওয়া কাছে আসে,
আর কোনো মৃত্যু যেন আমি আর ভাবতে পারি না—
কলকাতা শহর থেকে চোখ রাখি পাশের আকাশে।
প্রেম ? না সমস্ত ঘৃণা ? যা হও তা হও, তুমি—তুমি,
অসমাপ্ত জল থামে অচ্ছোদ চোখের আড়াআড়ি ;
আমি কি স্রোতের শ্যাওলা ? কি বলো হে গ্রাম বাংলাদেশ ?
যদি ডাক দাও, তবে একবার ভেসে যেতে পারি ॥

এইখানে

এইখানে
কিন্তু শুধু এখানেই নয়, আশেপাশে
বেঁচে থাকবার আগে যতোটা সময় আছে, ততোটা সময়
শেষ না হ'তেই যেন বেঁচে-থাকা শুরু হয়েছিলো, শুরু হয়,
ট্রাক-ভরা বাঁধাকপি চলে আসে উত্তর দক্ষিণ পূব থেকে—
মেয়েরা জড়িয়ে ধরে সমর্থ-শরীরে নীল উলের পশম, খুলে নেয়
এইখানে, শুধু এইখানে
সাত মানুষের ভিড়, তবুও হাজির ঐ নিঃশব্দ গলির মুখে
থালা-ভরা চাঁদ, ভালোবাসা,
পার্কে ব'সে হাওয়া খায় কলকাতা শহর, তার কব্জির উপর
ঘুরঘুর পোকার মতো মিনিট সেকেণ্ড ; তার বুকের ভেতরে
কিছুটা শ্লেষ্মা, কিন্তু ওষুধবিষুদ আছে, তাছাড়া সময়—
যাও যেখানেই, কোনো ভাষার সমস্যা নেই, ভঙ্গি রয়েছে
আছে হাতে-জোড়া-দেয়া হাত, অখণ্ড বনাত, আছে চলন্ত হৃদয়,
যতো কাঠগুঁড়ো ঝরে, ততো গ'ড়ে ওঠে, ততো কাঠ
মিছিল শিল্পের মতো রুপোলি স্যাণ্ডেল প'রে
চ'লে যায় শখের দোকানে,

এইখানে
কিন্তু শুধু এখানেই নয়, আশেপাশে
বেঁচে থাকা নিয়ে আর মিটিং না ডেকে, বেঁচে থাকা
হাতে হাতে বহুদূর এসেছে এগিয়ে—

তার উড়েছে পতাকা ॥

চিত্রা

এই মেয়ে প্রথমে জানে নি, আমি তবু
অভ্যাসবশত কিছু ভালোবাসা দিতে গিয়ে তাকে
নতুন জন্মের মতো করেছি প্রতিভূ ।

এখন গাণ্ডীব ছেড়ে, সে ধরেছে রঙিন চিরুনি,
এইভাবে কিছুদিন যাবে ॥

প্রেমের কবিতা

এই একটা জায়গায় কেমন
হিসেব মিলছে ব'লে মনে হয়।
তুমি কাছে আছো ব'লে
কাঠবেরালির মতো শরীরের অংশ লাফ দেয়—
বিশ্বাস ক'রো না, বুঝে নাও,
এই একটা জায়গায় আমার
বেঁচে থাকা জানালা খোলার মতো স্বাভাবিক
সপাট জানালা ॥

একটি চন্দ্রাহত কবিতা

একসঙ্গে বোঝা যায় না—তাতে কতোটুকু ক্ষতি! এই যে আড়াল
বার বার ভ'রে দেয় আখরোট আকাশ; ছাদ মিনারেট থেকে পাখি উড়ে আসে
তাতো চোখে দেখা যায়। গাছ ও ছায়ার ফাঁকে, পিতা ও শিশুর আড়ে
আলো ও আঁধারে—

প্রথমে যায় না বোঝা, কখনো কখনো বোঝা যায় বা আভাসে।
সিনেমা দেখায় ছবি : শূন্য-থেকে-ছুঁড়ে-দেয়া চাঁদির টাকার মতো
পুরনো পৃথিবী,

ঝামার ভেতরে গর্ত—ঐ চাঁদ! তার চেয়ে ছউ-নাচ ভালো;
ভালো চানাচুর, কিংবা সিং-তোলা গাছের তুফান; আরো ভালো উঁই-ঢিবি;
এই যে সহজভাবে ব'লে ফেলা—তা-ও ভালো। সমস্ত আড়াল
ভেবে দ্যাখো আমাদেরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গূঢ় জমিদারী—
পুরোটা যায় না দেখা; নৌকোয় রবীন্দ্রনাথ ঘুমিয়েছিলেন, জেগে উঠে
ধ্যানে বসেছেন, আর বাংলাদেশ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে এসেছে এগিয়ে.

অথচ শুরু না হ'লে, আরম্ভ না জোগালে কোথাও
এভাবে হ'তো না! এতো ডকুমেন্টারির ভিড়, হৈ-চৈ, এতো খয়রাত,
আজ এইখানে থাকি, কাল যাই আরেক ওখানে (যদি যাই!),
পুরোটা যায় না দেখা—নাই বা দেখাক, কিন্তু সমস্ত আড়াল
জ্যোৎস্নার ভেতরে গাছে নেমে আসে রূপার্ত করাত ॥

স'রে যেতে গিয়ে

স'রে যেতে গিয়ে দেখি, এখনো আড়াল থেকে
আলো ঝরে গাছের ওপরে,
একটি কি দুটি বেনচ্ খালি প'ড়ে আছে—আর পার্কের নীরব
কোনে যতো গাছ, গাছে যতো পাতার শিহর,
এখনো আড়াল থেকে আলো ঝরে সবার ওপরে।
শুধু তাই নয়, কিছু বাঞ্ছিত, নীরব
প্রেমিক-প্রেমিকা, নারী, শিশু ও শিশুর জননী
সবাই এসেছে এই দুপুর-বিকেলে—যেন
আমাকে এপার থেকে যতো খুশি দেখে নিতে দেবে
এখনো আড়াল ছুঁয়ে আলো কেন
আকাশ বা গাছ থেকে স'রে স'রে
প্রিয় মানুষের মুখে পড়েছে লুটিয়ে—
চলে যেতে গিয়ে দেখি
একটি কি দুটি বেন্‌চ্, আমার বসার জায়গা,
খালি প'ড়ে আছে ॥

তোমরা লক্ষ্য করো

আমার উৎসর্জন তোমরা লক্ষ্য করো।
ডিম-ভাঙা পাখির মতো আমি জেগে উঠছি।
এখন নদীতে নৌকো এসে ভিড়লো,
জলপ্রপাতের মতো বেরিয়ে আসছে কিশোরকিশোরী
দূর-বলয়ের চাঁদে আস্তে আস্তে উড়ে যাচ্ছে ওরিয়ল ;
দোকান-পাট খোলা হচ্ছে ; ছাতা-হাতে এগিয়ে আসছে মাস্টারমশাই ;
আমিই সব তদারক করছি ; আমার ঘুম এখন ভেঙে গেছে :
আমি আজ স্বাধীন, নিশ্চিন্ত।
ডালপালার মতো, শিকড়ের মতো পৃথিবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাবো এখন ;
আমার উৎসর্জন তোমরা লক্ষ্য করো—লক্ষ্য করো ॥

ঘুম ভাঙার পর

এক সময় ঘুম ভেঙে যায়—
ভারি হাওয়া, চারপাশে অনন্ত স্তব্ধতা, চারপাশে
অন্য মানুষজন ঘুমিয়ে রয়েছে ঃ কাছের আকাশে
তারা নেই, দূর-চন্দ্রযানে যারা অনন্ত নাচায়
তাদের হাতের কাছে কারা আছে ? যন্ত্র ? স্বপ্নের বড়ি ?
এখন. এখানে
আমার নিজের পাশে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমিই বিনিদ্র, তবে আমি কি প্রহরী ?
পিতামহ, তোমার ঘড়িটি কেন উইল-বাবদ আজো দাওনি আমাকে !
এখন জামিরে কিছু শিশির পড়েছে—দূরে, একফাঁকে
ক্লান্ত জাহাজ-বাঁশি শোনা যায়। ভাবি ঃ মরি মরি !
এই যদি সুন্দর ভুবন, তবে কেন সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা
কাগজ কলম হাতে চাঁদ-তারা-মানুষ-নিসর্গ সব
বুঝতে বসেছি ॥

স্বপ্ন

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ক্রমশ হাত-বদল হচ্ছে পৃথিবীর—
চাঁদ এসে বন্দী হচ্ছে আমার বাগানে,
ডেঁয়ো পিঁপড়ে চ'লে যাচ্ছে গাছের বাকল থেকে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
তরুণ কবি আমায় বলছে দুম্‌কার দিকে চ'লে যেতে-
যেখানে চন্দ্রাহত মোষ লাফ দেয় জলার ওপর,
মাঝ-রাতে বাসা-বদল করে দুটো ঝিঁঝিঁ পোকা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুম ভেঙে গেছে আমার, আমি এখন সদা জাগ্রত ॥

অনন্ত মুহূর্ত

যা ব'লতে চাও
ঠিক সেদিকে স্পষ্ট ক'রে তাকাও ঃ
কিছুই নয়, বিশেষ কিছু নয়
দরজা খোলা প'ড়ে ছিলো ; ফাঁকা-রাস্তা ;
কোথাও কেউ নেই—
বাঁ-দিক থেকে একটা লোক এলো।
কী ব'লতে চাও ? পৃথিবী যে পলকে পলকে
পালটে যায়, সে তো সবাই ব'লে গেছে,
তবু যখন খোলা-রাস্তা একটিমাত্র লোকের তালে মাতাল
তখন তুমি কথা ব'লতে চাও—যেন তুমি মুখোস খুলে
আলো দিচ্ছো লণ্ঠনের মতো—
অমন ক'রে জ্বলতে চাও কেন ?

একটু পরে

শান্তভাবে, ওরা এখন একে ও অন্যকে
পাগল ক'রে দিতে পারে।
যদি দুঃখে-শোকে
মানুষজন্ম পুরনো এক জামার মতো খুলে রাখতে চায়
তবে বরং উবে যাওয়া ভালো ছিলো। তার বদলে
বেঁচে থাকার যোগাড়যন্ত্র ক'রে
ওরা এখন কোথায় এসে থেমে আছে !
এদিকে এক প্রচণ্ড বর্ষণ
দেয়াললিপি ধুয়ে দিয়ে, উড়ে যাচ্ছে অনন্ত নির্জনে-
ওরা কথা বলছে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ও হ'লো।
ভালো আছে।
একটু পরে ওরা সবাই পাগল হ'য়ে যাবে ॥

আমার সৌন্দর্য আজ

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে পড়ে।
চারপাশে কলমীলতার
নীল, অনির্বচনীয় আঁকিবুকি—
তারই একফাঁকে নামে সুতো-বাঁধা চাঁদ, আলো দেয়,
সন্ন্যেসীর মতো বসে ধ্যানমগ্ন, নিস্তব্ধ মহিষ—
কে পারে এমন ছবি আজ মুছে দিতে?

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে যায়।
শিশু ছুটে আসে, তার দুই হাতে বিন্যস্ত লাটাই;
বিবাগী সাইকেল চলে ঢালু বেয়ে; লাল, পোড়ো জমি;
সব যেন লুট ক'রে নিয়ে গেছে
আমার মুখের রেখা, আমার পায়ের প্রতি ঠাম,
সব যেন সর্বস্ব আমার
বারবার ছিন্ন ক'রে গেছে!

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে পড়ে—
পৃথিবী সুন্দর হয় একতিল বেশি॥

খরগোশ ও দ্রোঙ্গো

মোজাইক-মেঝে-টানা সংসারের কঠিন উঠোনে
দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে পোষা খরগোশ খেলা করে,
হাওয়া এলে, তার উৎস খুঁজে দেখে, কখনো-বা মানুষের
পায়ের পেছনে
তুলোর বলের মতো ছুটে যায় ঘরে।

একদিন দ্রোঙ্গো উড়ে এসেছিলো।
দ্রোঙ্গো মানে কালো কাক—মাথার চুড়োটি শুধু ঈষৎ টিকোলো,
খরগোশ দূর থেকে দেখে নিলো
কোনো কাক তার মতো নয়, কোনো পাখপাখালির আলোড়ন

তার নিঃশব্দ ভাষার মতো সূচিমুখ নয়, তবু একা
শত জটিলতা-ঘেরা গার্হস্থ্য ঘরের মাঝ থেকে
একবার মানুষের দিকে, আরেকবার নতুন কাকের দিকে চেয়ে
মুখে ঘাস—কাঁপায়ে কিছুটা উঠে—একপাক দৌড়ে চ'লে এলো ॥

বর্গেরি

"বর্গেরি বর্গেরি"—ব'লে ঝাঁপ দিই নিস্তব্ধ মাঠের মাঝখানে :
কোথায় বর্গেরি ? শুধু মাঝরাতে সজনে পাতায় ঝুরুঝুরু
চাঁদ ঝ'রে পড়ে—আর শেয়ালের তীক্ষ্ম সাইরেন
প্রহরে প্রহরে বেজে যায় ।
যে যতোটা ব্যগ্র, আর মৃত্যুর কূপের মুখোমুখি
তারই দিকে বন্দুকের নল থাকে ঈষৎ বাড়ানো,
পশু, পাখি, পতংগ, মানুষ ব'লে আলাদা আলাদা কিছু নেই
শুধু উপস্থিতি আছে, আর সার্চলাইটের মতো ঘূর্ণ্যমান
প্রকৃতির নিজস্ব মুকুর,
তাই তীব্র শব্দ হয়, আর মাঝরাতে স্মৃতির সন্ধানরত
মানুষের বুকের পাঁজর ছিঁড়ে যায়
আমি তবে কি বর্গেরি ?

জন্মেছিলাম

জন্মেছিলাম ; এখনো বেঁচে আছি :
এছাড়া সবই রৌদ্র, সবই তুষার—
মিছিল থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে পাগল,
বাগানে. নীল মাছি ।
জন্মেছিলাম ;
জন্ম হয়েছিল
এখনো বেঁচে আছি ॥

নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি

বুকে হেঁটে কার্নিশ হয়েছো পার—
এখন আকাশে
কীভাবে উঠবে, তুমি তেমন জানো না।
আমার আঙুলে যদি জাদু থাকে
আমার আঙুলে
যদি সুতো চালবার মতো কুশলতা থাকে
তাহলে তোমাকে আমি এক পলকের মধ্যে আড়ালে পাঠাবো
তুমি জেট-অপ্সরীর মতো উড়ে যাবে সঠিক প্রবাসে ··
আমি কব্জিভর কোনো লাটাই টাঙিয়ে
তোমার উত্থান-টানে গা ভাসিয়ে দেবো।
বুকে হেঁটে এখন নিয়েছো হ'তে
জমি পার, আমি খুব কাছে
জেগে আছি।
এক-পা এক পা ক'রে
তুমি যতো বেড়েছো, আমিও
মুঠোর নিশ্চিত পেশী ততোবার শক্ত রেখেছি,
এখন কি বলবো, বলো'
শুধু বলি, ছিঁড়ো না চাতুরী—
যদি বেঁচে থাকতে চাও,
সুতোশুদ্ধু গোঙাও রভসে ॥

কোনো সমুদ্রের স্মৃতি

সবই ভেঙে যাবে বলে মনে হয়।
একদিন, নুয়ে পড়া নৌকোর গলুই থেকে চুঁয়ে
গান, ও লন্ঠন সব ভেসে যেতো জলের ওপরে।
এখন ধ্বংসই দেখি প্রকৃতির মূঢ় ব্যবহারে—
মানুষেরই মুকুর প্রকৃতি।

যে-যুবক এসেছিল দীর্ঘ বিরহবেলা বেলা কাটাতে এখানে
সে এখন দ্রুত উঠে, হোটেলের ঘরে ঢুকে যায়।
এমনকি চিঠিও লেখে না।
যেমন মানুষ, ঠিক প্রকৃতিও তেমনি খেয়ালী।
এই এক ভয়ানক রীতি ॥

রবিবার

লাল ঘুড়ি বুকের ওপরে ঠেকে যায়।
তুমি কোন দিক থেকে সুতো পাঠিয়েছো ?
তোমার রঙীন ঘুড়ি, হে কিশোর,
আমি আজ ফেরত দেবো না—
ছাতে গিয়ে, ওড়াবো আকাশে ॥

এ জীবন

যে আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে যেন আমার পুণ্য হয় ;
মিথ্যের বেসাতি করছে যারা, তারাও যেন শান্তি পায়—আর কিছু নয়
এদিকে উষ্ণ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর পাড় ধসছে, গড়ে উঠছে অনন্ত ওপার,
তপ্ত শলাকার মতো গ্রহপুঞ্জ বিঁধছে আমার একশোতলা বাড়ির জানালা,
একদিন নিচে নেমে দেখবো—বাগান ভরে উঠছে, সাইকেল চালিয়ে আসছে
কিশোরকিশোরী ;
বৃষ্টি থেমে গেছে, কবিসম্মেলনের জন্যে তৈরী হচ্ছে সবাই।

যে আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে যেন আমার পুণ্য হয় ॥

এসো

এইভাবে হবে, এইভাবে—
একদিন শাশ্বত ইঁদুর এসে সমস্ত জ্যোৎস্না কুরে খাবে
ততোদিন, এসো, বেঁচে থাকি,
ততোদিন কিছুটা খোরাকি
তুলে নিই সাধের রেকাবে,
দু'একটা ঠাণ্ডা শসাকুচি······

এইভাবে ॥

আমি আছি

আমি তো সঙ্গেই আছি
তোমরা শুধু দেখতে পারো না,
মাঝেমাঝে গর্তের ভেতরে যেতে হয়,
মন্দিরের আগে যে রকম গোপুরম—
অর্থাৎ আমার
সাময়িক নিবিষ্টতা প্রয়োজন
অর্থাৎ আমার
কিছুদিন অন্তর্ধান চাই,
তবু তোমাদের চিঠি,
সংবাদ-কাগজ
আমি নিয়মিত পড়ি।
আমি তোমাদের
দূর থেকে ছুঁয়ে আছি।
একদিন পতংগের মতো ঠিক উড়ে যাবো
ঘরের ভেতরে ॥

কোনো তরুণীর জন্যে প্রার্থনা

এক জায়গায় এসে
আমরা সবাই কিন্তু দেখে ফেলতে পারি।
পুরু-লেন্স-চশমা-চোখে মেয়েটি এখন গেলো গাছের আড়ালে,
তার মুঠোর ওপর থেকে লাল পিঁপড়ে তাড়িয়ে দেবার ছলে
বুশ-শার্ট-পরা লোকটি কিছুটা ঝুঁকলো ; এইদিকে
শিক্ষার্থী গাড়ির পাল পা রাখতে না পেরে শুধু হর্ণ দিচ্ছে—
শীত শেষ হ'য়ে এলো ; এখন ক্যানাডা থেকে
উড়ে-আসা-পাখি ঘরে যাবে,
শিশুকে খাওয়াতে হবে জননীর, জননীকে
শিশু খেতে দেবে।
এই জায়গা থেকে, দ্যাখো, আমরা সবাই কিন্তু
এই জায়গা থেকে আরো
দু'তিনটে অন্য দিক দেখে নিতে পারি,
আনন্দ বেদনা ঝরে, আনন্দ বেদনা অভিরাম* *
পুরু-লেন্স-চশমা-পরা মেয়েটিকে কেউ আজ দুঃখ দিয়ো না।

নতুন খেলার জন্য

আরো কিছু তীব্র খেলা হবে, মনে হয়।
সব যেন স্তব্ধ হ'য়ে আছে।
বৃষ্টি এলে, নারকোল-ডালের বেহালায়
রোদ হ'লে, উঠোনের ছড়ানো জাজিমে
পুতুলেরা মানুষ মানুষ খেলা ক'রে
উঠে যাবে শখের শহরে।
ততোদিন আমি ব'সে দেখি
কিভাবে নতুন এসে ক্ষয় করে যা কিছু সাবেকি ॥

গ্রীষ্মাবকাশ

আরো কাছে। মেঘবলয়ের খেলা সেরকম নেই তবু কিছুটা আভাসে
মানুষ যেখানে ব'সে ফোটো তোলে, জানলার জাফরি থেকে এভারেস্ট, আলো
ও আলেয়া,
তারই কাছে? নুটু আছে সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে, কলকাতা গিয়ে তার
বাবাকে সোয়েটার দেবে, নিজের বানানো,
অর্থাৎ, উড়ুক্কুভাবে উঠি-উঠি ক'রে যেন থেকে যায় কয়েকটি মানুষ. যুবজন,
এমনকি বিয়ে করে—হনিমুনে জেনে নেয় পাহাড়তলীর আলোছায়া,
আরো কাছে: দুপুরেই শুয়ে ওরা প্রেম করে—ফটিক বলেছে
(আজ ফটিক কোথায়?)
আরো কাছে: বিহ্বল, বেদনাময় মানুষের অনন্ত নয়ন—
যেন ভাষা জানা নেই, ভঙ্গী রয়েছে, তাই
স্তম্ভিত সকাল ॥

মেলা দেখাও

কোন জায়গায়, কোন কোন জায়গায়
তুমি আছো? তুমি মানে মানুষ;
রেডিওতে কারা গাইছো দেহলীর সাধন—
বাউল, তুমি বাইরে এসে বাবু সাজো!

সাধন-ভজন ভালো, কিন্তু ডেরা কোথায়,
বাড়ি আসতে দেরি হ'লো, পথে দেরি?

কোন জায়গায়, কোন কোন জায়গায়
তুমি আছো ? ঘৃণা-ভালোবাসায় তৈরি ? ভারি গড়ন ?
কলকাতা বা কেঁদুলি, আমায় মেলা দেখাও, মেলা দেখাও

আমি টিকিট কিনে মানুষ দেখবো ॥

আবিষ্কার

সুখদুঃখ এক জাঙাল প'ড়ে ছিলো—
আবিষ্কার শুধু এইটুকু।
নইলে, ফলতার বাংলো উপলক্ষ ছাড়া কিছু নয়,
উপলক্ষ একরাশ নেশাখোর কর্কশ ছাতার
তালরস নিয়ে শুধু কাঠঠোক্‌রার সঙ্গে মৃদু প্রতিযোগী,
এমনকি ভূতে-পাওয়া রাত বারোটার কালো জল
গূঢ় তর্জনীর মতো ছিপ্‌নৌকো জেগে ওঠে ঢেউয়ের আঘাতে···
তাও শুধু সূত্রপাত, আবিষ্কার এভাবে ঘটে না,
আমি ও আমার সঙ্গী, বান্ধবী, পত্নী বা স্বজন,
দুশো বছরের দুর্গে পা দিতেই, কখন জেগেছে
ভেজা লতা-গুল্ম-ডাল সুখদুঃখ অনন্ত আড়াল
সবই যা ভেতরে ছিলো, চারেরিয়া ভূখণ্ড প্রাকার
শুধু উস্‌কে দেয় হাওয়া,
তারপরে আমরা একাকী—
আবিষ্কার শুধু এইটুকু ॥

সৈকত-আবাস : দীঘা

কেন হয় না ? ঘুম, জাগরণ তবু শেষ নয়—
এরই কোনো ফাঁকে
কুয়াশা-আড়াল-করা নিঃশব্দ সকাল ; বিছানা ছাড়িয়ে
আধো-চেনা মহিলাটি দিক বদলাতে যান স্বামীর সকাশে ;
কেন হয় না ? তবে কি প্রস্তুত নই স্বভাবত ? পারি না এখনো
সী-ভিউ হোটেল থেকে নেমে গিয়ে সমুদ্র-বেলায় হেঁটে যেতে ?

ঘুম জাগরণ ঘোরে নিয়মিত। তবু তো ভেতরে
খুঁড়ে খুঁড়ে চলে এক মেধাবী পোকার আঁকিবুকি !

পথ ছিঁড়ে উঠে আসে হাওয়া ; আমাদের
সময় হয়েছে, শোনো, সময় হয়েছে,
শোনো, সমস্ত সময়
কেন হয় না আপামরে ভালোবাসা ? কেন এর পরে
পারি না মিলিয়ে যেতে ঠাস-বুননের মতো সঠিক জীবনে ?
ঘুম জেগে-ওঠা, ঘুম ঃ অবিরল ঢেউ এসে পড়ে ॥

কার্সিয়ং নামো ডাক-বাংলো থেকে

টানা-বারান্দার মতো ঝাউবন—
রবারের চাঁদ নেমে আসে ;
এখানে আমার কোনো সঙ্গী নেই ; আছে টেলিফোন ;
বুনো কুকুরের দল উঠে আসে ঘরের ফরাসে ॥

সদর অন্দর

কোথাও, ভেতরে লেগে, শব্দ হয়।
খরগোশ-কানের পাশে এপাশ ওপাশ উসখুস—
কার হুইসেল বাজে এইভাবে ? সমস্ত সময়
কে এমন জাগ্রত পুরুষ ?

ওরা দৌড়ে এসেছিলো ঃ হলুদ পোশাক, নীল কবচ-কুণ্ডল,
শাদা গাড়ি
এলোমেলো শব্দ ক'রে দ্রুত চলে গেলো।
তখন দিই নি সাড়া—কেন দেবো ? আমি সাবধানী—
ততোদিন বানিয়েছি বাড়ি।

এখন সবাই যেই চ'লে গেছে ; ঘর রুদ্ধ ; আকাশ মেঘেলা ;
ভেতরে ভেতরে যেন খ'সে পড়ে দ্রুত ডালপালা।
শুধু শব্দ কুরে খায় ; উঠে আসে বীজের ঘুরুনি

ভেতরে ভেতরে ॥

চৌকাঠ থেকে

তুমি কতোটুকু পারো ?   ঐদিকে সমস্ত আড়াল প'ড়ে আছে।
একটি কাকের শব্দে পুরো পৃথিবীর শান্তি ভেঙে যেতে পারে
পাঁচ-দশটা লোক এসে দশরকমের কথা বলে—
তুমি কি তাদের প্রতি মনোযোগী ? তুমি কি এখনো
কিছুটা নতুনভাবে বেঁচে থাকবার কথা ভাবো ?

মৃদু কলতলা জুড়ে জল-পতনের খেলা চলে ;
তুমিও কুঠুরি ছেড়ে যেতে চাও আরেক রকম অবসরে—
শুধু হাত কেঁপে যায়, দুই পায়ে জড়তা ঘোচে না,
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকে কতোটুকু পারো, ভেবে দ্যাখো !

মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ ?

সেই রেলিংগুলোর কথা মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ—
খেলাচ্ছলে আপনি যাদের প্রহার করতেন ?
পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো সিঙ্গিমামা কাটুম
আপনার ক্লাস পড়ানোর ঘন্টা আর ফুরোতো না* * *

এখন যদি বাংলাদেশে থাকতে পারতেন
তাহ'লে দেখতেন, রেলিংগুলো বড়ো হ'য়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে গেছে,
সিঙ্গিমামারা কবিতার খাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—
আপনার হাতের বেত ঘরের একপাশে প'ড়ে আছে !
—ক্লাসের ঘণ্টা আর বাজে না ॥

জীবন বিষয়ক

যাই বলো, তাতেই কি রাজি ?   রাজি নই।
আমাদের যেতে হয় আরো দীর্ঘ পাড়ির বিবেকে,
মানুষজন্ম নিয়ে আর কোনো ছেলেখেলা নয়, একে ওকে
ঘৃণা ভালোবাসা, কিংবা স্রেফ্ আলিংগন দিয়ে বুঝে নেয়া ভালো।

মূঢ়তা অনেক হলো (আপেক্ষিক শব্দ ?) ; বেলা যায়—
উজান টানের মতো স'রে যাই, চঞ্চল মাছের
সূচিকর্মে গড়ে-ওঠা জলের নক্‌শার কাছে ঘাই দিয়ে উঠি ;
এই তো জীবন—এই থেমে-থাকতে-না-পারা ভুবনে
অনিন্দ্য আড়াল তবু ভ'রে ওঠে শস্যে ও শিমুলে, অবেলায়।

এখনো সবার পায়ে বসতে পারি না, কারো কাছে
নতজানু হ'তে পারি—হ'য়ে যাই—মানুষজনের অবিরল
দায়-দায়িত্বের কথা তুমি আমি সবাই তো বুঝি। তবে কেন

আমি কোন দিকে আছি, এই নিয়ে কানাঘুঁষো রটে ?

অন্য কবিতার প্রতীক্ষা

ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত
ভেঙে যায়, থাকে শুধু গাভীর মতন নীরবতা।
দাঁত-করাতেরা সব বনের ভেতর থেকে শিস্ দিয়ে ওঠে—
কবিতা কি তার মতো ? মৃদু ও অমোঘ ? অবারিত

বুকের ভেতর থেকে বুকের বাইরে আলো ধরে ?
ঝরা-পাতা ঠেলে তার ভাঙা সাইকেল নিয়ে এসেছে যুবক,
সে কি সিগন্যাল করে কবিতায় ? করে কি জোনাকি ?
ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত থেমে যায়,
থেমে যায় ফাঁকি ॥

শিকার

লেগে থেকে থেকে দেখি
হুইল বা হাতে আর সুতো ঠিক মাপছে না। দাঁতে—
এবার কি শক্ত ক'রে ধ'রে নেবো আমার আঙ্গিক, ভালোবাসা ?
লেগে থেকে থেকে দেখি
সময় হয়েছে' ব'লে হাওয়া উশখুশ ক'রে
আমারে তাতায়,
উড়ো ফাৎনায়, শুনি, কেঁপে ওঠে রঙীন মেশিন।

ওপারে কে জেগে ওঠো ?   মাছ বুঝি !—তুমি কি শিকার ?
নাকি প্রভু আমাদের, জলের আঁধার থেকে
প্রিয় সমাচার কিছু দিতে এসে
হঠাৎ প্রবলভাবে, ছিপ কেড়ে নেবে ?

লেগে থেকে থেকে বুঝি
এখন প্রশ্ন মানে পলায়ন।
আরো চাই ক্লেশ-স্বীকারের স্বাধীনতা, আরো কিছু ভাষা—
হুইল বা হাত থেকে
রোখ্ চলে এসেছে উপরে,
এখন রয়েছি আমি, দাঁতে দাঁত, সুতো কামড়িয়ে—

ওপারে কে জেগে ওঠো ?—মাছ বুঝি ! তুমি কি শিকার ?

স্বীকারোক্তি

কঠিন বিষয় আমি কখনো মানিনি।
এই অপরাধ হোক জ্যোৎস্নার ভেতরে জানাজানি।

যদি ক্ষমা করো, ভালো ,   যদি ভৎ‍‌সনা করো, তাও ভালো
এই সরলতা হোক জ্যোৎস্নার ভেতরে জানাজানি ॥

বাজি

হেরে যেতে না পারো, দাঁড়াও।
একদিন সমস্ত কিছুর জন্যে প্রাণ দিতে হবে মনে হয়।
আপাতত এসেছে কিরাত, তাকে যুদ্ধের ছলে তুমি আবাহন করো ঃ

তোমার আমার জন্য নয় এই বরাহ, তবুও
বাজি ধরো তাকে ॥

এ খেলা সহজ নয়

এ খেলা সহজ নয়, জলের ওপরে এক বিমূঢ় কলস ভেসে যায়,
এখন কোথায় তবে কতোটুকু ধ'রে রাখা যায়, কেন যাবে ?
জলে দৌড়ে যায় জল, বিমূঢ় কলসে আর কিছুই ওঠে না।

যদি শক্ত কিছু হ'তো, ঠেকে যেতো হাতে বা ভেতরে,
ইঁট বা কাঠের তৈরী, হাতির দাঁতের কৌটো পাথরে বাঁধানো,
অথবা এমন কিছু, গিঁঠ দিলে রুমালে আঙুল থেকে যায়।

এ খেলা সহজ নয়, জলে দাঁড় ফেলে জল, জলের আড়ালে
শুধু আমাদের দেহ কিছুটা সাঁতার কাটে, বাকিটা পারে না—
যদি ভরে নিতে চাই, জলের ভেতরে এক উম্মাদ কলস ভেঙে যায়॥

আছে, টান দাও

আছে একটা, স্পষ্ট বোঝা যায়, টান দাও।
এখন উপড়ে করো, এখন উপড়ে ক'রে সব মেলে ধরো,
বেলা যায়—
সমুদ্রমাছের মতো ঝলকে ঝলকে শুধু শাদা বা রুপালি
আছে, স্পষ্ট বোঝা যায়, বড়ো ভুলভাবে আছে, কিছু বা একেলা,
—টান দাও।

যদি বাইরে যেতে হয়, তাও ভালো, ভেতরে থেকো না,
যদি ভেতরেই হয়, বাইরে থেকো না, ঘরে যাও,
যদি ঘরে ও বাইরে হয়, একই সঙ্গে সমস্ত নাচাও,
ঝলকে ঝলকে তোলো লোনামাছ, সাদা ও রুপালি একাকার।

এখন তো টান দেয়া সোজা, দাও টান—
ভেতর উপড়ে করো, ওষ্ঠ বড়ো বেদনায় নীল, কথা দাও।

আবহমান

কেউ থেমে থাকে না কিছুতে।
বৃষ্টি শেষ হ'য়ে গেলে, ল্যান্সডাউন রোডের নদী
পার হ'য়ে যাবো।

দু'আনার বেলফুল সাদা রুদ্রাক্ষের মতো
বাঁ-হাতে জড়িয়ে
যাবো কি বেড়াতে ?
ওদিকে তখনই
খোঁড়া-ভিখিরির পাশে টাই-পরা যুবক চলেছে,
এসেছে বনগাঁ থেকে কবিসম্মেলনপ্রিয়
তিনটি তরুণী,
এক লরী কবি নিয়ে
তারা সকালের দিকে দেশে চ'লে যাবে।

কোনো কিছু ঠেকে না কিছুতে।
ভালোবাসা ল্যাসোর মতন ঘিরেছিলো,
আজ তাকে দিয়েছি জড়িয়ে—
এখন মুক্তি শুধু অ্যারিনার ওপারে, আকাশে,
যে কোনো যুগল যায়, তাকে বলি—
ছুঁয়ে দাও তারা
শুধু উঠে যাও ব্রীজে,
একবারও থম্‌কে থেকো না······
ডাঙা মিশে গেছে জলে, জলে নৌকো,
নৌকোয় বাসর,
কেউ থেমে থাকে না কখনো ॥

অন্ধকারে আরো কাছে এসো

জ্বলে উঠেছিলো, কিন্তু আজ নিভে গেছে।
অন্ধকার। অন্ধকারে আমরা একাকী।
বন্ধুরা, আরো কাছে এসো।
শত্রু হে, তুমি তো আসবেই, কাছে এসো।
প্রেমিকারা, বড়ো দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, কাছে এসো।
কাছে এসো, সমস্ত জীবন।

মুখে খড়কুটো নিয়ে যে পাখি এসেছে, তার কাছে,
সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে,
যে ভাঙা-বিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেলো, আজ তারো কাছে
আমি করজোড়ে বলি : এসো, কাছে এসো,

অন্ধকারে আমরা কেন এখনো একাকী ?

এসো, ঘর বাঁধি

এখন কোথাও, এসো, ঘর বাঁধি।
চারপাশে চঞ্চল ভূগোল স'রে যায়।
মাঠ মাঠে নেই, জল জলের ভেতর থেকে বাইরে এসেছে,
সাইকেল দুলিয়ে নিয়ে ছেলেরা যায় না কোনো পথের ওপরে,
প্রিয় খরগোশ, সেও লাফ দিয়ে আসে না ভেতরে—
সবাই সংকেত করে একদিকে ঃ
এই ঘর আমাদের নয়,
এই জল-মাটি-হাওয়া আমাদের নয়।

তাহ'লে নতুন ক'রে, এসো, ঘর বাঁধি।
চঞ্চল ভূগোল স'রে যায়।।

পশু, পাখি এবং মানুষ

"কী যে হয়!"—ব'লে, চ'মকে উড়ে যায় পাখি,
তারো কিছুক্ষণ পরে প্রতিধ্বনি "কী যে হয়, কী যে হয়, কী যে ..."
পোষা খরগোশ ছিলো—সেও ছুটে গিয়েছে বাগানে,
ঘাসের পৃথিবী কিছু ভিজে।

পশুপাখি নিয়ে খুব ভালো থাকি—অথচ বিকেলে
বিশুদ্ধ প্রতীক হ'য়ে ওরা আসে কবিতার দিকে।
আমি বাধা দিই, বলি ঃ "সরাসরি এসো,
সবাই নিজস্ব হও নিজের নিরিখে।"

"কী যে হয়! কী যে হয়!"—টুনটুনি চ্যাঁচায়, এক ফাঁকে
খরগোশ লাফিয়ে ওঠে দ্রাঘিমার কিছুটা ওপরে—
সবাই জড়িয়ে আছে মানুষজনের পাকে-পাকে,
অথচ, সময় মতো, নিজের মতন নড়ে চড়ে।।

আমার চুরুট

ভেতরে ভেতরে জ্ব'লে যাচ্ছে, অথচ বাইরে ছাই জমছে না
এই আমার চুরুট—
একে তোমরা লক্ষ্য করো ঃ

অনেকক্ষণ থেকে পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে,
যারা কাছে থেকে দেখছে, তাদের চোখে বিস্ময় ঃ
কেন এমন হ'লো !

এ নয় শুকনো পাতা, যা হাওয়ার ঠোকরে প'ড়ে যাবে।
ঋতুচক্রের অঙ্ক এখন স্তব্ধ। কোনো নিয়ম এখানে খাটে না-

শুধু যখন পুরোটা দেহ আগুনের আঙুলে গ'লে যাবে,
যখন আর উঠবে না ধোঁয়া, অথবা চুম্বনের মতো শব্দ,

তখন সবাই ব'লবে ঃ
আহা, পুড়েছিলো ! সারাজীবন পুড়েছিলো !

আজ কেঁপে যায়

কেঁপে যায়—
একদিন সব ছিলো সিজিলমিছিল, একটানা,

বিয়ে হ'তো, তার পর সাজানো সংসার ঝিলিমিলি,
ম্যাজিক-লণ্ঠন ছিলো, পুব-দেশ থেকে আলো ছড়াতো উঠোনে —

যাদু-পটুয়ার হাতে খুলে যেতো একরাশ রুপোলি সোনালি
মানুষ বানিয়ে নিতো নিজের ইচ্ছেমতো আনন্দ-পুতুল,
শীতের আরম্ভ হ'লে বেগুনী পাতার ভিড়, হাওয়া এলোমেলো,
প্রতিটি মানুষ যেন কবিতা লেখক, হাতে সুটকেস নিয়ে স্টেশনে
নেমেছে

তার পর ? আরো ছিলো। কে জানে কোথায় আজ !
—এই গূঢ় অবেলায়
কেঁপে যায়,
সমস্ত দুহাত কেঁপে যায় ॥

প্রিয় মাটি

প্রিয় মাটি, এখন মৃত্যুর কথা শুধু ভাবি,
তোমাকে ভাবি না।
তুমি গাছ-ফুল-লতা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছো,
সমস্ত মানুষজন তোমার বুকের ওমে লুকিয়ে রয়েছে-
ট্রেন আসে যায়, যেন তুমি খেলনা গড়েছো,
তাই খেলা,
তাই খেলা রাত্রিদিন, এখানে ওখানে, আশে পাশে,
প্রিয় মাটি, তুমি ত্যাগ আমাকে করেছো, নাকি
আমিই তোমাকে ?
এখন মৃত্যুর কথা শুধু ভাবি, তোমাকে ভাবি না ॥

পোড়া কাঠ

পোড়া কাঠ, তুমি কার গন্ধ নিয়ে আসো ?
আমারই কি গতজন্মের শব পুড়েছিলো
হিন্দু স্বদেশে ?
এই জন্মে এখনো তো বেঁচে আছি, তবু কেন তোমার ধোঁয়ায়
এইভাবে দৃষ্টিভ্রম ঘটে ?
আমি মরে যাইনি তো, পোড়াকাঠ ? মানুষের সন্দেহ-ঘৃণায়
আমার অস্তিত্ব আজ উবে যায়নি তো ?

মনে রেখো, আমি আজও ভালোবাসা অনুভব করি।
মনে রেখো, আমি আজও এক দৌড়ে মাঠের ভেতরে যেতে পারি

পোড়া কাঠ, তবু কেন বার বার
তীব্র, কটু গন্ধ নিয়ে আসো ?

স্বগতোক্তি

সব অপমান তুমি পাল্‌টে নাও —
ফুল করো, মেঘ করো,

রঙিন ফানুস ক'রে আকাশে নাচাও,
এইভাবে বাঁচো।
নাহ'লে জীবন এসে গ্রাস ক'রে নেবে,
মানুষজনের হাতে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে একা,
এখনো—সময় থাকতে—বেঁচে থাকবার কথা ভাবো,
যেভাবে প্রকৃতি পারে, সেইভাবে সব অপমান
ফুল-লতা-পাতা ক'রে নিসর্গে ছড়াও ॥

কবিতার জন্ম

আমি সব টের পাই!
আলিসায় একা কাক মুখে ভাঙা-অন্ধকার নিয়ে
বসে আছে, তার ডানার ঝাপট
সোজা বুকে এসে লাগে।

সে কি জানে, সে আমাকে একটু একটু ক'রে
শব্দ ও ভাষার দিকে নিয়ে যায়?
এভাবে সংকেত করে সব কিছু—আমি লুফে নিই
যা কিছু খবর, বার্তা, প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে
যা আমাকে রশদ পাঠিয়ে চলে আজীবন।

কাক উড়ে যায়, আমি আমার কলম নিয়ে
স্তব্ধ পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ি একা ॥

যেভাবে অসুখী যায়

যেখানে অসুখী যায়, সেইখানে যাবো—
বাত্যাতাড়িত মেঘ, তুমি জানো কোথায় ঠিকানা?
নীলযক্ষ বাড়িঘর আগলিয়ে রেখেছে শহর।
সপ্তাহে দুবার যাই গর্চারোডে পালক ফেরাতে—
ভালো কি ভালো না, আমি আজও বুঝতে পারিনি,
শুধু জানি যেখানে অসুখী যায়, যেখানে মানুষ

পর্দা-ঠেলার মতো সূর্যাস্ত সরিয়ে খোঁজে কোথায় ময়ূর,
আমি সেইখানে যাবো, সেইখানে ধুলোরাস্তা ভ'রে
বালক নেমেছে যেন সাইকেল থেকে ; মানুষজনের কাছাকাছি
আর কোনো ছবি নেই, আর কোনো দৃশ্য নেই চোখে—
বাঁটুল-বাজনা শুধু বেজে ওঠে দীপকবাবুর বাড়ি থেকে,
যেভাবে অসুখী যায়, বাত্যাতাড়িত মেঘ, আমি যাবো ঠিক সেইভাবে ॥

বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়

বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়—
অর্ধেক মানুষ আজ মরে আছে আমার স্বদেশে।
মরে আছে, তবু তারা কথা বলে,
বাসে ওঠে, বাস থেকে নামে,
পরস্পরের দিকে থুতু ছুঁড়ে হো হো ক'রে হাসে।
এত গাঢ় অন্ধকার, প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না সহজে।
কিন্তু যদি দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ করা যায়,
শরীরে সমস্ত রক্ত এক জায়গায় জড়ো হয়,
তাহ'লে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে-বাইরে-চ'লে-আসা
বিদ্যুৎ-চমকে দেখা যায়—
অন্তত অর্ধেক লোক মরে আছে আমার স্বদেশে ॥

টান পড়ছে

টান পড়ছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পাই,
সমস্ত শরীরমনে টান পড়ছে
একূল ওকূল। লোনা বালি, সমুদ্রের হাওয়া,
নর্তকীর মতো ঠিক পাক খেয়ে উঠছে উপরে—

এখনি কি সমস্ত উত্তর দিতে হবে ?
এখনি কি দাঁড়িয়ে পড়তে হবে
দুহাত বাড়িয়ে ?
এখনি কি আলিংগনে চিনে নেবো সঠিক প্রেমিকা ?

কিছুই জানি না, তবু সমস্ত মুচ্‌ড়িয়ে দিয়ে
একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে, স্পষ্ট টের পাই ;
বুঝতে পারি—
আমার সর্বস্ব নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি-খেলা করছে সমুদ্রের হাওয়া ॥

সাতদিন পর

সাতদিন কবিতা লিখিনি ।
এই ফাঁকে, নর্দমার জল বেড়ে গেছে ।
হেলিকপ্টার গেছে মেঘের অনেক নিচু দিয়ে
আরেক আকাশে ।
যাদবপুরের মোড়ে, ছেলেরা হৈচৈ ক'রে
শান্ত হ'য়ে গেছে ।
আরো হয়তো ঢের কিছু ঘটে গেছে—
আমি সব বুঝতে পারিনি ।

সাতদিন কবিতা না লিখতে বসার কষ্ট
বুকে বিঁধে আছে । এখন প্রস্তুত হই,
মনে মনে বলি ঃ তৈরী হও,
শুকনো পাতা চ লে যায় উত্তরে-হাওয়ার পিছু পিছু,
তুমি সেইভাবে যেন ছড়িয়ে প'ড়ো না—
বরং, গর্তের ভেতর থেকে যেভাবে বাদাম এনে
কাঠবেরালীর শিশু শব্দ ক'রে খোসা ভেঙে ফেলে,
তুমি সেইভাবে আজ শব্দ ভেঙে শব্দের ভেতরে চ'লে যাও,
এখন, অষ্টম দিনে লিখে ফেলো একটি কবিতা ॥

দীঘা ঃ ১৯৭৬

প্রকৃতি কি নারীর শরীর মনে হয় ?
পুরনো উপমা ; কিন্তু "রাহা-লজ্‌" একটু ছাড়ালে
নিঃশব্দ বালুর স্তূপ স্তনের মতন উঠে গেছে—
মসৃণ নিতম্ব, নাভি ঝিক্‌মিক ক'রে ওঠে এখানে ওখানে ।

ঝাউবনে, আহত ঘোড়ার মতো ভাঙা নৌকো বাঁধা আছে
গাছের গুঁড়িতে
চাঁদ ডাক দিলে, হয়তো চীৎকার ক'রে দৌড়ে চ'লে যাবে।

এদিকে অজস্র লোক, গিশগিশ ভিড়, হাসাহাসি,
চন্দ্রভূষণ ধর গুজব লেলিয়ে গেছে সি-ভিউ হোটেলে।
এত হিংসা করে কেন অনেকে আমাকে ?
এই হিংসা খুব ভালো নয়।
আমি মনে মনে বলি ঃ যেভাবে বোল্ডারে এসে
ঠিক্‌রায় জোয়ারের সমুদ্রের ফেনা,
তারপর স'রে যায়, কয়েকঘণ্টা পরে আস্তে ফিরে আসে,
জল ও ডাঙার ঠিক সন্ধিতে হেঁটে গেলে দু'একটা খুচরো ঢেউ
কুকুরের মতো এসে পায়ের পেছন চেটে দেয়—
সেইভাবে কখনো বা কাছে থেকে, কখনো বা একটু স'রে গিয়ে
তুমিও স্পর্শ করো তোমার জীবন একাএকা—
যেভাবে স্পর্শ করে পুরুষ নারীকে।
পুরনো উপমা ?

একটু একটু আগুন

একটু একটু আগুনে আমায় স্পর্শ করে—
করুক ঃ আমার এই খেলা খুব পছন্দসই।
পুড়তে পুড়তে একটা কিছু হ'ল যাবোই,
অনেক বছর বেঁচে আছি এই শহরে।

যেমন আগুন, তেমনি তার উন্মাদনা,
হাত-পা-মুখ ঝ'ল্‌সে ফেলে নিয়মমতো,
আমি তখন ঘুরে বেড়াই ইতস্তত—
আড়াল থেকে ফেরাতে চাই তীব্র ফণা।

কিন্তু যেই ঘুরে দাঁড়াই মুখোমুখি,
সোনার রং উথ্‌লে ওঠে আয়না জুড়ে,
কিছুটা যায়, পুরোটা তো যায় না পুড়ে—
আগুন, ওরে আগুন, আমি অল্পে সুখী॥

আমি যাই

ফাঁকা-বাগানের মধ্যে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, আমি যাই।
চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা প'ড়ে গেছে এক গর্ভিনী কুমারী,
আমি যাই।
ধবধবে চাদর পেতে গান গাইতে বসেছেন গুনী,
আমি যাই।
পোলট্রি থেকে ব্রয়লার-মুরগী নিতে হবে, নইলে রান্না হবে না।
আমি যাই।
যে-চাঁদ যতীন বাগচীর কোনো কবিতায় উঠেছিলো, সেই চাঁদ
আজ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; আমি যাই।
ঐতো একটু দূরে জীবন রয়েছে—সুখ-দুঃখ-ঘৃণা প্রেমে
ফুঁসে উঠছে সমুদ্রের মতো।
আমাকে ডেকো না, আমি যাই।

স্তব্ধ সেলাই-কল

স্তব্ধ সেলাই-কল
তুমি আর কতোদিন এইভাবে থাকবে, ভেবে দ্যাখো ;
কত কাজ বাকি আছে, কত কাপড়ের স্তূপ
তোমার পায়ের কাছে ডাঁই হ'য়ে আছে,
তুমি কি নক্শা বুনে, সুতোয় সুতোয় মিল
দেবেনা আবারো ?
তুমি না পোশাক দিলে
পৃথিবীর কত লোক বস্ত্রহীন থাকবে, ভেবেছো ?
তুমি না নক্শা দিলে, সুন্দরীর গায়ের ব্লাউজে
কোনো ফুল ফুটবে না।
শুধু উপচার, শুধু খণ্ড খণ্ড বস্তুর ভেলায
সবকিছু আবর্জনার মতো প'ড়ে থাকবে তোমার শিয়রে
স্তব্ধ সেলাই-কল,
এইবার টেলিপ্রিন্টারের মতো কথা ব'লে ওঠো।
ঝর্ণার তোড়ের মতো
ধক্ ধক্ নেমে এসো কাজের ভেতরে ॥

ভোর

একটু একটু ক'রে
সব কিছু পরিষ্কার হ'য়ে আসে।

মানুষ বুঝতে পারে, তার দুঃখের ভেতরে
দুটো পাখি ক্রমাগত দানা খুঁটে নেয়,
তার সুখের ভেতরে
একফালি কচি আম গন্ধ নিয়ে আজো জেগে থাকে।

একটু একটু ক'রে
সব কিছু পরিষ্কার হ'যে আসে।

কুয়াশা স'রতে, চোখে পড়ে
মাছভর্তি ডিঙি-নৌকো ; জাল হাতে মাঝিরা দাঁড়িয়ে।
খুব শান্তভাবে, গান ধরে অলস ভিখিরি।

আর কিছুক্ষণ পরে, রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট দেবে॥

একা

একা একা কিছুদূর যাওয়া যায়।
তারপর খুব ক্লান্ত লাগে।
মনে হয়, পাশে কেউ থাকলে ভালো হতো'।
তখনই কি নাভিমূল থেকে
সৃষ্টি লতিয়ে ওঠে শূন্যের ভিতর ?
অনন্তশয়ন একটু দুলে ওঠে ঢেউয়ের আঘাতে ?

মাঝরাত্রে, একে একে পাতা ঝ'রে পড়ে,
শিশুর মতন শান্ত, রিকশার চালক থাকে
ধুলোয় ঘুমিয়ে।
চাঁদ ওঠে, যেরকম উঠেছিলো চিরদিন,
একা মানুষের দুঃখ
রাস্তার কুকুর শুধু বুঝতে পেরে, শব্দ ক'রে ওঠে॥

পোষা খরগোশের প্রতি

পোষা খরগোশ, তুমি কোনোদিন একটুও শব্দ ক'রো নি।
তুমি শুধু ঘুরে ঘুরে, ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে
নিজের গণ্ডির মধ্যে খেলা ক'রে গেছো।
শুধু লাল-চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেছো
সব কিছু ঠিক জায়গায় আছে কিনা !
টেবিলের পায়াটাকে তোমার কি শালগাছ মনে হয় ?
বারান্দার টবটাকে মহুয়ার বিহ্বল জঙ্গল ?
নর্দমার মুখটুকু কোনো গর্তের আড়াল ?

একদিন চিল এসে ঝাঁপ দিয়েছিলো।
বারান্দার দেয়ালে-দেয়ালে হঠাৎ বিশাল ছায়া দেখে
তুমি একছুটে এসে, আমার পায়ের কাছে ঘর চেয়েছিলে।
যা বলার, তা তুমি নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে
আমাকে বলেছো।
মনে রেখো, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

পোষা খরগোশ,
একদিন আমিও তোমার মতো বোবা হ'তে চাই ॥

কার জন্যে

কার জন্যে সাতদিন কবিতা না লিখে
তুমি ব'সে আছো ?
এইভাবে কিছুই হবে না।
কোনো জাদু নেই, যাতে এক মিনিটের মধ্যে
সব কিছু সঠিক জায়গায় গিয়ে পেঁৗছে যেতে পারে।
তেমন মানুষী নেই, যাকে তুমি সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিতে পারো.
তেমন বন্ধু নেই, যে তোমাকে. সমস্ত গুজব ছেঁকে,
ঠিকমতো সাড়া দিতে পারে।

এখন কী ক'রবে, তুমি ভাবো।

সমস্ত পৃথিবী কিন্তু অন্যদিকে তৈরী হ'য়ে আছে।
জারুলগাছের নিচে বেবি-অস্টিনটাকে কিছুটা থামিয়ে
কারা যেন প্রকৃতির শোভা দেখছে।
দুটো মেয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে, আবার দৌড়ে দৌড়ে
চ'লে গেলো।
একটা ফানুস উড়লো। দুটো কাক। সন্ধে হ'য়ে আসে।

কার জন্যে সাতদিন কবিতা না লিখে
তুমি ব'সে আছো ?

প্রেম অপ্রেম

আর কিছু নয়, শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা
আমাদের সমস্ত জীবন ঘিরে থাকে।

একটি মেয়ের কাছ থেকে
আরেকটি মেয়ের কাছে গেলে
হৃদয় কি ভেঙে টুক্‌রো হয় ?
সমুদ্র উথাল হ'য়ে তাড়া করে ঘরের ভেতরে ?
কয়েকটি মুহূর্ত শুধু ভালো লাগে, কয়েকটি প্রহর বড়োজোর,
তারপর ঘুরে ঘুরে পাতা ঝরে উঠোনের ঘাসের ওপরে,
ইঁটের পাঁজার মধ্যে চন্দ্রবোড়া এঁকেবেঁকে পথ খুঁজে নেয়,
বৃষ্টি থেমে গেলে, পার্কে গিয়ে বসা যায় প্রবীণের মতো।

কোন্‌ শাশ্বতী এসে এইসব এলোমেলো খেলা ভেঙে দেবে ?
পরিণামহীন, শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা
আমাদের সমস্ত জীবন ধ'রে ছায়া ফেলে ছাতিমের মতো ॥

ওলটপালট নয়

ওলটপালট ক'রে কথা ব'লতে ভয় পাই।
এইভাবে কেউ কেউ কথা বলে।
এইভাবে কেউ কেউ বিখ্যাতও হ'য়ে যায়, দেখি।

আমি নাজেহাল সুতো মুঠোর ভেতর লুফে নিয়ে
কারুকাজ শুরু করি একা একা,
অন্তত একটা নক্‌শা টাঙিয়ে রাখতে হবে
আমার জীবনে।
তাতে কার লাভ কার ক্ষতি—সেসব কে জানে ?
বিদ্যুচ্চমকে আজ বাড়িঘর স্পষ্ট দেখা যায়—
ন্যাড়া গাছ, আকাশ করেছে তুক, তাই বৃষ্টি নামে,
স্বর্গ থেকে স্তন আসে, মেয়েরা লাগিয়ে নেয়
বুকের ওপরে।
এইসব ছবি আমি বারবার ধোয়ামোছা করি—
ওলটপালট নয়, যা দেখছি তা-ই লিখে রাখি।
অন্তত একটা নক্‌শা বুনে যেতে হবে
এই আমার জীবনে॥

শীতের ল্যাণ্ডস্কেপ

সামনে কি কিছু আছে ?
হাঁটুতে থুতনি রেখে জড়োসড়ো দেহাতী মানুষ
আগুন উস্‌কে দিয়ে, বেঁচে থাকতে চাইছে কোনোমতে—
লাল ছিট-দেয়া গরু এরই মধ্যে রাস্তা পার হ'লো,
দৈত্যের মতো লরী ছুটে এলো রাস্তার ওপরে।

সামনে কি কিছু আছে ?
পৃথিবী ক্রমশ খুব নিবিষ্ট, নিবিড় হ'য়ে আসে—
যেন ঠিক কিছু আগে শুরু হ'য়ে, কিছু পরে শেষ হ'য়ে গেছে
দু'একটা শুকনো পাতা ঘুরে ঘুরে গণ্ডী কেটে যায়—
কুয়াশায় রাস্তাঘাট পাল্‌টে যায় ম্যাজিকের মতো।

আরো একটু এগিয়ে না দেখতে পেলে
কিছুই কি স্পষ্টভাবে জানা যাবে ?
আরো একটু অনুভব, ঘৃণা, ভালোবাসা—
আরো একটু বেঁচে থাকা, ঠিক মানুষের মতো মানুষের কাছে
—এই সব সম্ভব হবে কি আর শীতের ভেতরে ?

'সামনে কি কিছু আছে ?'
একটা পাখি ক্রমাগত শব্দ ক'রে ওঠে।

এক অন্ধকার

এক অন্ধকার আছে,
তাকে নিয়ে দীর্ঘদিন বাস করা হ'লো।

দু' একটা ইঁদুর শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে চ'লে যায়।
মাঝরাত্রে, মেল ট্রেন চ'লে গেলে, ব্রীজের ওপরে শব্দ হয়
গাছ থেকে, ঘুরে ঘুরে দু'একটা পাতা খ'সে পড়ে!
ঈশ্বরের চোখ মুখ দেখা যায় না এমন আঁধারে।
মশারি নোঙর ফেলে বিছানায়—
আমি চুপি চুপি ঢুকি, হাই তুলি, কিছুই দেখি না।

বড়ো দীর্ঘদিন এই অন্ধকারে বাস করা হলো॥

এক মুহূর্ত

সাঁতারু বাঘের মতো
মেঘ ঠেলে, লাফ দেয় চাঁদ।
এখুনি একটা কিছু হবে, মনে হয়।

দুটো ডিঙি পাশাপাশি প'ড়ে আছে—
ঢেউয়ের চুমোয় তারা পাগলের মতো
যাবে কি যাবে না, ঠিক বুঝতে পারে না।
এখুনি একটা কিছু হবে মনে হয়॥

তুমি, আমি, সুবিনয়

তুমি আর সুবিনয়
অন্ধকারে জেগে উঠে, পায়চারি করছো একা একা।
আমি দেখতে পাই।

এই কিছুক্ষণ আগে তোমরা দুজনে খুব প্রেম করেছিলে

সুবিনয় তারপর চটি পায়ে বাথরুমে মুখ ধুতে গেলো।
তুমি বিছানায় ব'সে, বেণী বাঁধলে কিশোরীর মতো।
আমি সব দেখতে পেয়েছি।

তুমি আর সুবিনয় না হ'য়ে যদি বা
তুমি আর আমি আজ অন্ধকারে বেড়াতে যেতাম
তাহ'লে কি সুবিনয় কিছু দেখতে পেতো?
রাত বারোটার ট্রেনে দেরাদুনে চ'লে যেতো একা।
নয়তো, মাতাল হ'য়ে বমি ক'রতো গলির ভেতরে।

সুবিনয় দেখতে পেতো না॥

জননীর সঙ্গে মুখোমুখি

জলপাইবনের মুখে স্তন্যদাত্রী জননীর সঙ্গে দেখা হ'লো।
ঘোর বৃষ্টি, ঘোর ঝড়, তবু জননীর বৃন্ত থেকে
আকণ্ঠ শুষে নিতে চাই ব'লে
আমি তার পিছে পিছে ঘুরি।
আমি যে বুভুক্ষু, রুগ্ন, আমার যে হাত-পা-শরীর
আজও তেমন বাড়েনি,
আমি যে ধ্বস্ত, ছন্ন ক'রে দিতে পারি না সবারে,
এই দুঃখে আমি সেই দুর্বোধ নারীর দিকে
ধাওয়া ক'রে আসি।
"আজ দিতে হবে, দাও,
আমার মুখের মধ্যে পুরে দাও স্তন—"
আমি এই সূর্যাস্ত-ডোবানো বৃষ্টি, ঘোর কালো রং,
জলপাইপাতার স্তূপে কাঠখড়মের মতো
প'ড়ে-থাকা পদচিহ্ন ভুলে
তার কাছে ছুটে যাই; তার দুইহাত ধ'রে টানাটানি করি।

বহু দীর্ঘদিন পরে জননীর সঙ্গে দেখা হ'লো॥

সুন্দরবন

এখন ভাঁটায় জল নেমে গেছে—
বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়।
হেঁতালের ডালে ব'সে দু'একটা বাঁদর শুধু কিচ্‌মিচ করে

একদিন আমরা খুব কাছে আসতে পেরেছি—
পারিনি কি ?
প্রেম হয়েছিল খুব ; বিবাহাদি হ'লে
হয়তো সন্তান হ'তো একটি কি দুটি।

এখন ভাঁটায় জল স'রে গেছে—
ঘৃণার পিচ্ছিল দাগ
কাদার ওপরে খুব হিংস্র জেগে আছে।

হেঁতালের ডালে কারা শব্দ ক'রে ওঠে ॥

দুর্জ্ঞেয়

কিছুই যায় না জানা।
অন্ধকারে, সজনেখালির খাল স্তব্ধ হ'য়ে আসে।
লঞ্চের চাকায় যদি ঘুঙুর বসানো যেতো, তবে হয়তো
ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হ'তো কিছু !
সুন্দরবনের সব পশুপাখি কোথায় পালালো ?

কিছুই যায় না জানা।
আমরা, যারা কিছুক্ষণ আগে খুব গল্প করেছি
তারা অচেনার মতো একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে আছি।

ক্যানিঙে পৌঁছুলো লঞ্চ : এইবার বাড়ি ফিরে যাবো ;

মানুষ এবং মানুষ

মানুষকে কেঁপে উঠতে দেখে
অন্য মানুষ স্থির থাকে।

মানুষকে জেগে উঠতে দেখে
অন্য মানুষ শুতে চায়।

"তোমরা কী ক'রলে!" —ব'লে
রাতপাখি শব্দ ক'রে ওঠে।
ব্লেডের মতন শীত
ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে ওঠে জ্যোৎস্নার আলোয়।

শুধু সভাসমিতিতে
কিংবা কোনো হুজুগে মিছিলে
মানুষের সঙ্গে এসে
অন্য মানুষ যোগ দেয়।

তবু
মানুষকে মরে যেতে দেখে
অন্য মানুষ সুখী হয়।

মানুষকে বেঁচে উঠতে দেখে
অন্য মানুষ ছুরি শাণে ॥

মুংকের একটি প্রিণ্ট

মুংক, নরওয়ের শিল্পী, চিৎকারের ছবি এঁকেছেন।
একটা প্রিন্ট আমার শোবার ঘরে টাঙানো রয়েছে।
আমি দিনে অন্তত একবার, ঐ ছবিটির দিকে্‌ তাকিয়ে তাকিয়ে
মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করি।
মানুষই কাঁদতে পারে এইভাবে, মনে হয়।
নির্জন ব্রীজের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—
যখন সামনে থাকার মতো কিছু নেই,

পেছনে দু'একটি লোক স'রে যাচ্ছে পাৎলা কুয়াশায়—
মানুষ নিজেকে নিয়ে কী করবে, বুঝতে পারে না।

যখন সে জন্ম নেয়, তখনো সে কেঁদে উঠেছিলো।
কিন্তু সে তো সকলেই কাঁদে!
এখন—অনেকদিন পরে—সে আবার প্রাণভ'রে কেঁদে উঠবে ব'লে
নির্জন সাকোয় উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
নিচে নির্বিকার নদী ; অনন্ত আকাশ ; তারা জ্বলে ।।

সমুদ্রের মতো

শুরু হ'য়ে গেছে, এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়।
তারপরে ? বলো, তারপরে ?
একদিন সব কিছু শেষ হ'য়ে যাবে।

মাঝখানে, সমুদ্রের ফুঁসে-ওঠা জল
শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। বালির পাহাড় ভেঙে
রাস্তা ক'রে নিতে হয় কাছে।
দুটো পাখি একসঙ্গে শব্দ ক'রে ওঠে।
চাঁদ ঝাপটিয়ে উঠে, ঢেউয়ের আড়ালে চ'লে যায়।

এই মাঝখানটুকু মানুষকে ভ'রে নিতে হয়।
ভ'রেও তো ওঠে। ওঠে না কি ?
একবার ভালোবাসায় স্বাদ পায়, যন্ত্রণার স্বাদ—কিছু পরে,
যেভাবে সমুদ্র পারে, সেইভাবে সে-ও বারেবারে
হৃদয় উপড়ে ক'রে মানুষজনের কাছে আছ্‌ড়িয়ে পড়ে।

শুরু হ'য়ে গেলে পরে, মানুষ বুঝতে পারে
শুরু হ'য়ে গেছে। তারপরে, আরো তারপরে
সে শুধু জড়িয়ে যায়, হাঁফ খোঁজে, আবার জড়ায়,
যতোদিন থাকে, ততোদিন
চাঁদ বুকে নিয়ে এক সমুদ্রের মতো ফুঁসে মরে ।।

কাঁটা বাবলার বন

কাঁটা-বাবলার বন—
সেইখানে সূর্য বিঁধে আছে,
তার নিচে, সমুদ্রের ঢেউ এসে
চেটে দেয় নিসর্গ প্রকৃতি।

কাঁটা বাবলার বন,
আমি মানুষের কথা
তোমার উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি,
কিন্তু এখনো পারিনি।

দুটি শিশু বিশাল বেলুন হাতে
সৈকত-রেখার দিকে চ'লে গেলো,
ঝাউবন ধক্ ক'রে কেঁপে উঠলো হৃদয়ের মতো।

কিন্তু যে-লোকটি, একা,
বালিয়াড়ি থেকে সব দেখে নিতে গিয়ে
রক্তাক্ত সূর্যের মতো তোমার শিরার মধ্যে
নিঃশব্দে, ঝ'রে ঝ'রে গেলো,
কাঁটা বাবলার বন, তুমি শুধু তার সাক্ষী থেকো॥

শ্বেত পারাবত

শ্বেত পারাবত, তুমি বড়ো বেশি দেরি ক'রে এলে-
আরো একটু পরে হ'লে, আমি ভাবতাম
এই পৃথিবীতে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই ;

শুধু ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঈর্ষা, হানাহানি।
গাছ থেকে গাছে শুধু বাদুড়ের অন্ধ যাতয়াত,
ঝড়ে উপড়ানো ফুলে পোকার গাঁথুনি,
আর সারা দেশ জুড়ে অম্লান শ্মশান।

তবু তুমি এইমাত্র উদ্‌ভাসিত হ'লে—
পেছনের দীর্ঘপথ ঝিনুকের মতো ক্রমে
ছোটো হ'য়ে এলো।

শ্বেত পারাবত, তুমি যে আমার কাছে আসতে পেরেছো—
ঢের ধন্যবাদ ॥

বাদুড়

কেউ কাউকে ধ'রে রাখতে পারে না এখন, মনে হয়।
মেয়েটি বলেছে, আর ভালোবাসা দেবে না তোমাকে।
স্বামী আর সেবাব্রতর সঙ্গে পুরী চ'লে যাবে।

তুমি নিজেকে তন্ন্‌তন্ন্ ক'রে প্রশ্ন করো ঃ
তুমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসা দিতে পেরেছিলে ?
নাকি বাদুড়ের মতো অন্ধকার ডালে ঝুলে থেকে
সব কিছু উল্‌টিয়ে দেখতে চেয়েছিলে ?
তার ফলে, কিছুই দেখোনি—

এখন সে তোমার দুহাত থেকে বাইরে চ'লে গেছে।
এখন পৃথিবী তাকে ধীরে ধীরে বশ ক'রে নেবে।
তুমি শুধু অন্ধকার ডাল থেকে ডালে
ঘুরে ম'রবে বাদুড়ের মতো ॥

জল

জল, শুধু জল, শুধু জল।
ছোটো স্লুস-গেট খোলা, আর আবর্তকুটিল ঘোলাজল
মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে।
আদিসপ্তগ্রাম থেকে প্রান্তিকের দিক ঘেঁষে
মেঘ চ'লে আসে।
বৃষ্টি এলে, আরো জল হবে।

আমি সুরমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি,
সুরমা অভ্রের দিকে।
আর শুধু জল, শুধু জল।
'ঐখানে দুদিন আগেও কিন্তু
জলের চিহ্নমাত্র কোথাও ছিলো না'
সুরমা জানালো,
'লাফিয়ে লাফিয়ে আমরা উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো জমি
পার হ'য়ে গেছি।'

আমি যেই পূর্বপল্লীর মাঠে
সুরমা, অভ্রের সঙ্গে বেড়াতে গেলাম,
মাটির ভেতর থেকে জল ফুঁসে উঠলো সহসা।

জল, আবর্তকুটিল রাঙা জল।।

বেলাভূমিতে জ্যোৎস্না

সমুদ্র শাসিয়ে যায়। তার কথা
আমরা কিছুটা বুঝি, কিছুটা বুঝি, না।

আধো অন্ধকারে, হাতের আঙুল
হাঁটুর ওপরে ঠিক কিভাবে রয়েছে
সেইদিকে লক্ষ্য রাখা যায়।
কিছুই তুচ্ছ নয়, এই কথা
সমুদ্র অনেকভাবে ব'লে যায়।
ঢেউ থেকে অন্তহীন ঢেউ জন্ম নিয়ে
আমরা যা অস্পষ্টভাবে কখনও বুঝেছি,
তাকেই স্পষ্টভাবে ব'লে দিয়ে যায়।

এই কিছুক্ষণ আগে
মেয়েটি আমার পাশে বসেছিলো।
তার নিতম্বের ভার, বালিতে বৃত্তের মতো
টোল রেখে গেছে।

একটা পালক উড়ে সেখানে নেমেছে ; কাঁকড়ার পাল
একটু একটু ক'রে এসেছে এগিয়ে।

কিছুই যে তুচ্ছ নয়, এই কথা জ্যোৎস্নার ভেতরে
খুব স্পষ্ট বোঝা যায় ॥

খেলা

মানুষ মানুষকে নিয়ে খেলা করে।
বেড়ালেরা, ওঁত পেতে থেকে
তারপর, উঠোনের বাইরে চ'লে যায়।
তাদেরও তো খেলা বাকি আছে !

"আমি ভালোবাসা চাই" ব'লে,
বাথরুমে একটি মেয়ে হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।
সাওয়ারের ঝর্না তাকে শান্তি দিতে পারে না এখন।
লাক্সের ফেনায় তার চোখ জ্ব'লে ওঠে।

এই মেয়েটির কথা ভেবে, মানুষের খেলার ধরন
কিছু বোঝা যেতে পারে। অন্ধকারে গাছের মতন
এ ওকে সংকেত করে মৃদুভাবে।
হাওয়া এসে এইসব নীরবতা ঠাট্টা ক'রে যায়।

বেড়ালেরা খেলা শেষ ক'রে দেখে
মানুষের খেলা কিন্তু তখনও চলেছে পুরোপুরি।
সাটিনের তাজ প'রে, পাইপ-ফ্লুট হাতে
কারা যেন ব্রীজ পার হ'য়ে আসে শহরের দিকে।

শুধু শব্দ হয়, আর আতস-কাচের বুকে
আলো লাফ দিয়ে উঠে, আকাশ ছাড়িয়ে চ'লে যায়।
ভালোবাসা পেলে কিন্তু, এইসব মানুষেরা
সুইচ নিভিয়ে, শুতে যেতো !

ছোটো পৃথিবী, বড়ো পৃথিবী

অন্ধকারে, প্রবল পাতার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়—
তুমি যা বলতে চাইছো, সেই কথা উঠোনের গাছ ব'লে দেয়!
ছোটো পৃথিবীরও এত জ্বালা-যন্ত্রণা আছে
তুমি আগে বুঝতে পেরেছো ?
যাকে ছোটো ভেবে, তোমার বন্ধুরা সব উপহাসে মাতে—
কফি হাউসে গিয়ে তিনটি চিকণ ছেলের সঙ্গে হাসাহাসি ক'রে
কফি খায়, সে-পৃথিবী সত্যি কি খুব ছোটো ?
সেখানে কি জন্ম-মৃত্যু-জীবন ঘটে না ?
দু'দুটো তিতির আজ বাগানের অনেক ভেতরে এসেছিলো।
শাদা পিঁপড়ের রাণী অন্ধকারে শুয়ে থেকে থেকে
হাজার হাজার ডিম প্রসব করেছে, সে খবর তুমি কাল
বইতে পড়েছো। আজ তার কিছুটা আভাস
জল ও কাদার মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে।
তুমি সব বুঝতে পেরে, শিরদাঁড়া সোজা ক'রে
বসে আছো। এইভাবে ব'সে থেকে থেকে

হঠাৎ প্রবল শব্দ শুনতে পেলে গাছের ভেতরে।
"ছোটো নয়, ছোটো নয়"—এই কথা হাওয়া ব'লে গেলো।
"ছোটো নয়, ছোটো নয়"—এই কথা দু'একটি মানুষ শুধু বুঝতে পেরে
কবিতার বই কিনে, বাড়ি চ'লে এলো।

বিশাল রঙিন বল অন্ধকারে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে মাটির ওপরে ॥

দু'পশলা বৃষ্টির ফাঁকে

দু'পশলা বৃষ্টির মধ্যে, যতোটা সময় থাকে
সেই ফাঁকে, পৃথিবীকে দেখে নিলো একটি মানুষ।

সবই ঠিক আছে, মনে হয়। সবই ঠিক থাকে।
বৃষ্টি হ য়ে গেছে ব'লে, রাস্তায় জল জমে আছে।
দু'একটা লোক শুধু হাঁটুতে কাপড় তুলে
হ্যারিসন রোড পার হ'লো।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তরুণ কবিরা
কাঁচ ম্যাগাজিন হাতে, একে ওকে নামালো ওঠালো।

এই যে বৃষ্টিপড়া বন্ধ হয়েছে
এরই মধ্যে, কলকাতা শহর খুব অন্যরকম মনে হয়।
যেন তার খুব জ্বর হয়েছিলো, বৃষ্টি এসে
তাকে কিছু স্নিগ্ধ ক'রে দিলো।
বাড়িগুলো ডানা ঝাপ্‌টিয়ে এসে
আবার নিজের নিজের মতো বসে পড়লো
রাস্তার এধারে ওধারে।
'টুং' ক'রে শব্দ হ'লো। একটা রিক্‌শা
গলি থেকে চৌমাথার দিকে চ'লে এলো।
কী মনে করাতে চায় এই শব্দ ? কার কথা ? কার জন্যে
বৃষ্টি হ'লো ? একঘণ্টা পরে
কেন বৃষ্টি থেমে গেলো ?

একফাঁকে, সব কিছু দেখে নিলো একটি মানুষ,
তারপর কবিতা লেখায় মন দিলো ॥

আমি বাধা দেবো

তোমাদের ঘুমের ভেতরে
আমাকে শুইয়ে দিতে গেলে
আমি বাধা দেবো।

তোমরা ঘুমের মধ্যে, দুঃস্বপ্নচালিত হ'য়ে
ঘোরাফেরা করো।
তোমরা ঘুমের মধ্যে
বাড়ি করো, বৌ-কে নিয়ে শুতে যাও ঘরে ;
আমি এইসব খেলা বুঝতে পারি না।

রোদের হাপুনে, দ্যাখো,
জল তোলপাড় ক'রে মাছ ভেসে ওঠে।

জ্যোৎস্নায় ধবল নুড়ি অন্য কোনো গ্রহের প্রতীক হ'য়ে
জেগে থাকে একা।
শেষ ট্রাম শিস দিতে দিতে
গুম্‌টির ভেতরে ঢুকে যায়।

আমি তোমাদের হ'য়ে
সব কিছু দেখে নিচ্ছি, সেইকথা তোমরা বোঝো না।
তোমরা যা দেখতে পারো না, তাকে শুষে নিয়ে
রক্তের ভেতরে আমি সব পাল্‌টে দিই।

ভালো থাকা

তোমাকে ফেরৎ দিয়ে
ভালো আছি।
এখন সমস্ত কিছু মেনে চলি, মেনে চলতে হয়।
এখন অন্ধের মতো এটা ওটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিয়ে
রাস্তা ঠাহর করি।
চারপাশে নানারকমের সব ভৌতিকতা আছে।
আগুন, আগুন আছে—কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও গোপনে।
তোমাকে ফেরৎ দিয়ে
আপাতত, খুব ভালো আছি।

বুকে ক্রমশই সব ঝ'রে পড়ে—
মরা পাতা, গাছের আড়াল থেকে চাঁদের বিনুনি,
আর ঘূর্ণ্যমান ছায়া, স্টিমার-চাকার সর্ সর্···
যাই, যাই, যাই ব'লে
যারা তবু কিছুটা দ্বিধায় থেমে থাকে,
তাদের চাইনি।

তোমাকে ফেরৎ দিয়ে ভালো আছি।
কতো ভালো আছি?

বাঁশি

বাঁশি একটা আছে।
থেকে যায়।

কেউ কারো বাঁশি ঠিক কাড়তে পারে না।
চেষ্টা করে। খুব চেষ্টা করে।

যখন সমস্ত ট্র্যাফিক এসে আছড়ে পড়ে রাস্তার ভেতর,
আলো পাল্‌টে যায় ; একটা অনশ্বর কাক
রেফারীর মতো ঠিক ব'সে থাকে পোস্টারের কিছুটা ওপরে,
তখন রাস্তার লোক এদিক ওদিক ক'রে
বাড়ি যায়, অথবা ওপারে গিয়ে ঘাসে ব'সে পড়ে।

তখন কোমর থেকে আড়-বাঁশি বা'র ক'রে নিয়ে
কে চকিতে সুর তুলে, গলির আড়ালে চ'লে যায় ?

তোমরা কি ঠিক তাকে চিনতে পেরেছো ?
তোমরা কি তার বাঁশি কেড়ে নিতে পারবে কখনও ?

বাঁশি একটা আছে।
বেজে যায়॥

প্রাণ, প্রবাহিত প্রাণ

প্রাণ, প্রবাহিত প্রাণ,
আবারও তোমার সঙ্গে এইভাবে দেখা হ'য়ে যাবে
আমি কখনও ভাবিনি।

চুল ছেঁটে, গড়িয়াহাটের মোড়ে
বন্ধুস্থানীয়ের ফ্ল্যাটে ভিভাল্দির বাজনা শুনে
নিচে নেমে দেখি
সমস্ত ফুটপাথগুলো শিউরে উঠে শাদা হ'য়ে গেছে।

আমার অনেকবার এরমধ্যে মৃত্যু হয়েছে,
আর যাকে 'মৃত্যু' বলে, তারো আগে
বহুবার হবে।
এই কথা বুঝে নিয়ে, গোলপার্কের কাছে চুপ ক'রে থাকি।
চেনা বা অচেনা লোক হিংস্র দৃষ্টি ফেলে চ'লে যায়।
কান পাতলে, ফিশফাশ ভেসে আসবে দক্ষিণের বাতাসের মতো।

তবু প্রাণ, প্রবাহিত প্রাণ,
ট্যাক্সিতে ওঠার আগে, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।
আমার অন্তত একটা বাড়ি আছে, যেখানে নিশ্চিতভাবে
চ'লে যেতে পারি।
আমার অন্তত একটা পৃথিবী রয়েছে, মৃত্যুভয়াতুর পাখি
যেখানে এখন আর শব্দ ক'রে ওঠে না বিকেলে।

ঝলমল ব্রীজের ওপর দিয়ে, স্থির সমতলে নেমে আসি ॥

অন্ধ প্রাণ, জাগো

(১)

অন্ধ প্রাণ, জাগো, জেগে ওঠো।
সমস্ত পৃথিবী আজ শুধুই তোমার জন্যে তৈরী হ'য়ে আছে।
তুমি যোগাযোগ করো। মানুষের সঙ্গে, গাছপালা প্রকৃতির সঙ্গে
খরগোশের সঙ্গে, কিংবা ঘাটশীলার চার্মাচিকে-ছড়ানো
সেই নুব্জ একবগ্গা বাড়িটির সাথে
উঠোনের আতাগাছে দুর্লভ ভ্রমর আজ সূর্যাস্তবেলায় ব'সে আছে···
সবাই তোমার সঙ্গে খেলা করবে ব'লে আজ ধৈর্যভরে অপেক্ষায় থেকে
মাঝেমাঝে শব্দ ক'রে উঠছে। হে অন্ধ, বিমূঢ় প্রাণ,
জাগো, জেগে ওঠো, কথা বলো।

তুমি কি জলের নিচে ছিলে এতোদিন?
কে তোমাকে লতাগুল্মে উদ্ভিদে-কাঁটায় ঢেকে রেখেছিলো?
মাছেরা যেখানে যায়, সেইখানে তুমি গিয়েছিলে?
মাছেরা কোথায় যায়, তা কি তুমি জানো?

আসলে কোথাও কেউ যায় না। সবাই সম্পন্নভাবে থাকে,
থেকে যায়।

ঈশ্বর বাঁশির মতো একটানা শব্দ হ'য়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে যান.
তাই আমরা কেঁপে উঠি। তুমিও তো কেঁপে উঠেছিলে,
কাঁপোনি কি ? হে অন্ধ, বিশাল প্রাণ,
সত্যি ক'রে বলো, তুমি কখনও কাঁপো নি ?

তুমি এই যে চরাচরে এসেছো, সেজন্যে তোমার কোনো
অহংকার আছে, মনে হয় ? তোমাকে তো দীর্ঘদিন
কাজ ক'রে যেতে হবে। ভালোবাসা, সোনার কলস,
ঘাটে এসে পেঁছুলে, তুমি তুলে নেবে।
ঘৃণা হিস্‌হিস্‌ ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে কাছে এলে
তুমি তার সঙ্গে সাধ্যমতো ব্যবহার ক'রো। তাকে
অবহেলা কখনও ক'রো না।
তারও প্রয়োজন আছে।

তুমি স্ফটিকে স্ফটিক হ'য়ে জেগে থাকবে, সোনার ভেতরে
হবে সোনার উপমা। রৌদ্রের ভেতরে,
উড়ে-যাওয়া চৈত্র-পত্রালীর ভিড়ে
তুমি ধীরে জেগে উঠবে,
তারপর শক্ত-মাটি পেয়ে, দাঁড়াবে গাছের মতো
পাথুরে জমিতে !
হে প্রাণ, হে অন্ধ, বিমূঢ় প্রাণ, তুমি জেগে ওঠো।
তোমার অনেক কিছু করণীয় আছে।

(২)

হে প্রাণ, তুমি কেন এখনও
ঘুমিয়ে আছো, আমি বুঝতে পারি।
তুমি অনুভব করেছো যে, জেগে ওঠা মানে
এক অসীম দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা।
প্রতিটি মুহূর্তে কিছু-না-কিছুর জন্যে
তৈরী হ'য়ে থেকে, তারপর আজীবন
তার জন্যে পরিশ্রম করা। সমস্ত সময়
জ্যাবন্ধ তীরের মতো মেরুদণ্ড টান ক'রে থেকে

ভুলে যাওয়া, বস্তুত কিসের জন্যে এসেছো জীবনে
বনের ভেতর থেকে দামামার শব্দ শুধু কাছে ভেসে আসে,
ফাঁসি-লটকানো চাঁদ দীর্ঘ-দেবদারু থেকে মুক্তি পেয়ে
শূন্যে উড়ে যায়।   চন্দ্রবোড়া চ'লে যায় দিগন্তের দিকে।
তুমি কেন এখনও ঘুমিয়ে আছো, হে অন্ধ, আতুর প্রাণ,
আমি যদিও বা বুঝি, তাকে সমর্থন কখনো করি না।
জেগে ওঠো।

(৩)

জেগে ওঠো।   এখন পৃথিবী খুব তৃষিত, তৃষ্ণার্ত
হ'য়ে আছে।   তাকে জল দাও।
তুমি জলের ভেতরে ছিলে দীর্ঘকাল, তোমার ভেতরে
আজও জল রয়ে গেছে।
তুমি যেই মুক্তি পাবে, আরো পাঁচজন কিন্তু
একই সঙ্গে মুক্তপ্রাণ হবে, এইকথা স্পষ্ট মনে রেখো।
তুমি একই সঙ্গে জল, আলো, গোধূম, অঙ্গার।
তুমিই ভোগ্য, তুমি ভোগী ;   তুমি দুদিকে সংসার রেখে
সচ্ছল নদীর মতো মাঝখান দিয়ে চ'লে যাও।
পৃথিবী তোমাকে নিয়ে দীর্ঘদূরে যাবে ব'লে তৈরী হয়েছে।

তুমি কি যাবে না ?

তীরবর্তী

কয়েকবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ব'লে
প্রতিবার, জীবনের কাছে ফিরে আসতে খুব ভালো লাগে।
নৌকো উল্‌টে প'ড়ে আছে ; শব্দ ক'রে জল উঠে আসে ;
মানুষ যে শৈশবে সাঁতার শিখেছে, এই কথা
ভুললে চলে না।

হে কাঁকড়া, তুমি আজ রক্তিম জীবনে উঠে গেছো।
তোমারও কি বহুবার মৃত্যু হয়েছিলো ?
দ্যাখো, এইমাত্র একটি মানুষ একা জ্যোৎস্নার ভেতরে হেঁটে এলো।

এখন সে তোমার মতো গর্ত খুঁড়ে নেবে।
মৃত্যুর ভেতর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে, তারপরে
যেখানে সমুদ্র এসে ডাঙায় মিলেছে
সেইখানে সবাইকে একসঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে ॥

সৌর-এলাকার নিচে

সৌর-এলাকার নিচে
আমাদের বনভোজনের পালা শেষ হ'য়ে এলো।
পুরোটা হয়নি শেষ ; এখনও কিছুটা বাকি আছে
বিকেল-সন্ধের ঠিক মাঝামাঝি, হাওয়া উড়ছে
শুকনো পাতায় ঢেউ তুলে।
কে যেন একটা ঘুড়ি আকাশে তুলেছে ; তার দিকে
একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি।

সৌর-এলাকার নিচে মানুষমানুষী
হাঁফ ছেড়ে, কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
পুঞ্জ পুঞ্জ রং জামের থোকার মতো
জলের ওপরে খ'সে পড়ে।

বন-ভোজনের পালা শেষ হ'তে কিছু দেরি আছে ॥

যে জীবন স্পন্দমান

যে জীবন স্পন্দমান
তার শব্দ মাঝেমাঝে কানে ভেসে আসে।
দেখো, যেন গর্ভনাশ না হয়, যেন শিশুটি এখন
অন্ধকার থেকে ঠিক বাইরে যেতে পারে।
যেন ডিম ভেঙে, পাখির শাবক ঠিক শব্দ ক'রে উঠতে পারে
সকালের দিকে।

ছোটো ছোটো পোকা উড়ছে—
তারাও সংকেত করে ফাঁকে ফাঁকে,

জ্যোৎস্নার মাঠের একপাশে
ছোটো, শাদা নুড়ি জয়জয়ন্তীর মতো শব্দ ক'রে ওঠে।
কেউ শোনে, কেউ বা শোনে না।

যে জীবন স্পন্দমান, তার গূঢ় টেলিফোন
স্নায়ু ছুঁয়ে, মন্ত্রের মতন বেজে যায়।
সারারাত বৃষ্টি পড়ে ধুলোর ওপরে।
সারাদিন, একটি পাগল একা
কান পেতে প'ড়ে থাকে ধুলোর ভেতরে।।

কয়েকজন কুমোরের কাহিনী

শূন্য থেকে পরিত্রাণ খুঁজি ব'লে
মাটি ও কাদায় আমরা একটা কিছু গ'ড়ে নিতে চাই।

পুতুল, পুতুল, তুমি ঠিকমতো তৈরী হয়েছো তো!
তোমার ওপরে কিন্তু আমাদের সব কিছু নির্ভর করে।
আমাদের আঙুলের টান্‌টোনে সমস্ত হৃদয় ঝ'রে যায়,
হৃদয়ের সঙ্গে, দ্যাখো, গ্রহ-তারা-অনন্ত আকাশ বাঁধা থাকে,
দুইচোখে যতোদূর দেখা যায়, তারো পরে আরো কিছু
ঝল্‌সে ওঠে যেন—

সেই দৃষ্টি মৃত্যু কিংবা পরাজয় কিছুই মানে না,
শুধু দেখে নিতে চায়, দেখে নিয়ে বুঝে উঠতে চায়
কিভাবে একটা ফল পেকে ওঠে, কমলা-গোলাপী
কোন্‌ রং ফুটে ওঠে আমের বোঁটায়—

শূন্য থেকে মুক্তি চাই।
শূন্য থেকে আমাদের পরিত্রাণ চাই।
আমাদের একটা কিছু গ'ড়ে যেতে হবে।।

ফড়িং

কাঠগোলাপের পাশে একটা ফড়িং একা
খেলা করছে।
তার দিকে দৃষ্টিপাত করো।

একটু দূরে, সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে
একটা লোক হয়তো তোমার জন্যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তাকে আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকতে বলো।

তুমি এইবার ঠিক জীবনের মাঝখানে
চ'লে আসতে পেরেছো।
ভেবে দ্যাখো, তার জন্যে অনেকটা সময় কেটে গেছে!
অনেক যন্ত্রণা, দুঃখ, অনেক অদ্ভুত কানাগলি—

তুমি আজ সব ঠেলে
যেখানে এসেছো, সেইখানে
কাঠগোলাপের পাশে চঞ্চল ফড়িং শুধু
খেলা করছে।

অন্য কিছু নেই, শুধু একটি ফড়িং—
আর তুমি ॥

জলের চকিত দাঁত

এই যে জলের ভেতর তুমি ঝাঁপ দেবে
তার আগে কিছু ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে।
কেন ঝাঁপ দেবে জলে? কার জন্যে? কে তোমাকে
ভালোবাসবে ব'লে, আর ভালোবাসা বিলোতে পারে নি?
স্রোত তো বইছেই, অনেক ভেতর থেকে ছোটো ছোটো জীবাশ্মর রং
একজায়গায় এসে ওপরে ভেসেছে। আহা, এত রং ছিলো পৃথিবীতে:
তুমি কি জলের এতটা কাছে না এগোলে, কখনো
বুঝতে পারতে? তুমি খুব কাছে এসে গেছো, বড়ো কাছে,

আর কাছে আসা মানে জলের তোড়ের কাছে চ'লে আসা,
তারপর ভেবে দেখা, যাবে কি যাবে না এই স্রোতের ভেতরে—

ভেবে দ্যাখো, তোমাকে যেতেই হবে। তুমি শুধু স্থির হ'য়ে
ভেসে যাও—যেভাবে ভেলায় চ'ড়ে মৃতদেহ ভাসে,
কিন্তু তুমি বেঁচে আছো, বড়ো বেশি বেঁচে আছো ব'লে
জলের চকিত দাঁত তোমার আঙুল ছিঁড়ে নেয়।
অন্ধকারে ছায়া-ছায়া ডাঙা, দেখা দিয়ে
আবার মিলিয়ে যায়। সবাই জলের পরিধি
শুধু ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ক'রে রেখেছে এখানে।
তুমি ঝাঁপ দাও—জীবন জলের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে॥

তর্জনী-সংকেত

এই একটু আলো, ছায়া, মাটি,
ঘুরে ঘুরে খেলা করছে।

চোখ দিয়ে দেখা যায়। চোখ দিয়ে ?
শুধু চোখ দিয়ে ?
আমি চতুষ্পাঠি খুলে সব কিছু বোঝাতে যাবো না।

একটা দেশলাই-কাঠি যতো দ্রুত জ্বলে
তারো চেয়ে দ্রুত কিন্তু অন্য এক আগুন কোথাও জ্ব'লে ওঠে।

বন্ধুবান্ধবীর মুখ ফ্রেস্‌কোর মতন ভ'রে যায়।
প্রেম এসেছিলো। কল খুললে, জলের ঝাপ্‌টায়
সব মনে পড়ে।

বেশি কিছু নয়। শুধু আলো, ছায়া, মাটি,
আলো, ছায়া···
ছাতা হাতে কে এখন গলির বাইরে গিয়ে
আকাশে তাকালো ?

আমি তর্জনী-সংকেত ক'রে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছি।
আমাকে কি চিনতে পেরেছো ?

কান পেতে শোনো

তোমার দুঃখের ভেরী বনান্তরালে বাঁধা ছিলো।
এখন যে বেজে উঠছে, তার জন্যে দুঃখ ক'রো না।
এরকমই কথা ছিলো। এরকমই ঘটে এ-জীবনে।
শুধু কান পেতে শোনো, শুধু বোঝো, শুধু অন্ধকার

আরো একটু গাঢ় হ'লে, লণ্ঠন জ্বালিয়ে জেগে থাকো।

স্তব্ধ নদী

মাঝে মাঝে, কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না।
স্তব্ধ বনতল জুড়ে বাদুড় বসেছে—
গাছ থেকে নেমে, মনে হয়। বাদুড়ের দুঃখ
আমি বুঝতে পারি ? আমার দুঃখ বোঝে
বাদুড়েরা ? এখন সমস্ত কিছু মিশে গেছে ব'লে
আলাদা আলাদা ক'রে কোনো কিছু চেনা যায় না—
শুধু অন্ধকার হ'লে, পৃথিবী ক্রমশ
খুব ছোটো হ'য়ে আসে—
আমি বাদুড়ের চোখ লক্ষ্য করি, বাদুড় আমাকে
দেখে কি দেখে না, ঠিক বুঝতে পারে না—

যে স্তব্ধ নদী আজ আমাদের দুজনকে ক্রমশ ভাসিয়ে
তবু স্থির হ'য়ে আছে

তাকে কোন্ উপমায় আমি প্রকাশ্যে জানাবো ?
মাঝে মাঝে, কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না ॥

তরী ভাসাও

কেউ ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
যতোদূর যেতে পারে,

তারপরেও হাঁ ক'রে থাকে দুঃখ আর আনন্দ।
তরী ভাসাও।

একটা সাদা হাঁসের মতো এসেছিলো একটি মেয়ে।
হাঁটু-জল, হয়তো একটু টান ছিলো, একটু বা ঘোর।
দেখা হ লো না।

সব ভুলগুলো শুধ্‌রে দেবার জন্যে
পৃথিবী আরো একটু বড়ো হ'য়ে যাচ্ছে,
সমুদ্রে এক চিল্‌তে হাওয়া, ঝড় নয়—

তরী ভাসাও॥

টিঁকে থাকা

এইখানে আমরা টিঁকে থাকি।
কাছে পিঠে সমুদ্র রয়েছে, শব্দ হয়।
রেলিঙে-ঝোলানো কোনো পাৎলা-শাড়ির-ফাঁকে-দেখা
নারকোলগাছের মতো আচ্ছন্ন, বিশাল
মনে হয় সব কিছু।
শুধু সমুদ্রের ডাকে ছাড়া-পাওয়া পশুর চিৎকার
আমাদের বিমূঢ়তা ছিন্ন ক'রে ফেলে।

এইখানে আমরা টিঁকে আছি।
আমাদের বন্ধু ছিলো; আমরা তাদের ফেলে
এগিয়ে এসেছি। আমাদের সমস্ত বিবেক
আজ গ্রন্থপঞ্জীর মতো বইতে লিখে আছে।
তবু কিছুই বুঝি নি ব'লে, সব কিছু কুয়াশায়
স্তব্ধ হ'য়ে থাকে।
আর সমুদ্রের ডাক এই নীরবতা ছিঁড়ে শব্দ ক'রে ওঠে।

পরাগের ভাই

সাদা ঝাউতলা দিয়ে চ'লে যেতে যেতে
পরাগের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো।
পরাগের ভাই খুব নিন্দে করে এখন আমাকে।
আগে ক'রতো না।

পরাগের ভাই, আর তার দাদা, মানে সম্পূর্ণ পরাগ,
আর পরাগের বৌ, তার যতো বন্ধু ও স্বজন
সবাই নিন্দে করে ব'লে
আমি ঝাউবন ধ'রে হেঁটে গিয়ে
সমুদ্রের দিকে চ'লে যাই।

পরাগের ভাই বলে ঃ
'দাদার দয়ায় তুমি বেঁচে আছো,
তবে কেন এতো ল্যাজ নাড়ো ?"
আমি এইসব শুনে সমুদ্রের দিকে চ'লে যাই।
নীল কার্পেট যেন দৌড়ে যেতে গিয়ে
কুকুরেরা, উলটে পালটে সব এলোমেলো ক'রে গেছে।
এখনো শব্দ হয়—কুকুরের, সমুদ্রের, ভয়ের।
আরো একটু দূরে এসে
বালির ঢিবিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি

পরাগের ভাই আর পরাগেরা
খুব যেন ছোটো হ'য়ে গেছে।
আর প্রায় চোখে পড়ছে না।
সমুদ্র এখনো পুরো দেখা যায়—
সংঘর্ষকাতর, ক্ষুব্ধ, অবশেষে জয়ী ॥

শুধু এই

কখনো, ঘুমের মধ্যে, কাঁটাতার পেরিয়ে পেরিয়ে
আমরা চ'লে যাই।

অথচ নিদ্রাও নয়, জাগরণও এমনি একাকী,
যেখানে সমস্ত কিছু মিশে যায়
সেইখানে কোনো পাখি ওড়ে,
দূর থেকে দেখা যায়, জল কতো শান্ত, কতো স্থির।
ছায়াই চঞ্চল, কিন্তু ছায়া আজ পড়ে না কোথাও—

জেল-ছাড়া কয়েদীর মতো
আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে এসেছি।
কাঁটাতার, সমুদ্রের অমোঘ চিৎকার,
সব অন্ধকারে উড়িয়ে উড়িয়ে
আমরা কখনো ঘুমে চ'লে পড়ি,
কখনো বা স্থির জেগে থাকি,
ঠিক ঘুম নয়, ঠিক জাগরণও নয়, শুধু এই ॥

জাগরণ

কখনো, আবছাভাবে, তোমাদের অস্পষ্ট ডাকে উঠে পড়ি।
তোমরা আমাকে ঠিক ডাকলে কিনা, বুঝতে পারি না।
হয়তো সঙ্গ খোঁজো, মদ্যপানের বন্ধু চাও,
কিংবা কিছুই চাও না, সময় কাটাতে এসে
দুটো রসিকতা ক'রে, আবার সন্ধের ট্রেনে চ'লে যাও বাড়ি!

কিন্তু আমি উঠে পড়ি! পৃথিবীকে ঝংকৃত দেখে
আমার এখন ভালো লাগে। কবে জন্ম হয়েছিলো
স্পষ্ট মনে নেই। কবে মৃত্যু হবে, তা-ও
সঠিক জানি না। এদিকে তোমরা যে ডেকে যাও।

তার জন্যে মৃদু আলোড়ন খুব শুরু হ'য়ে গেলো।
বাদুড় চঞ্চলভাবে বন থেকে বনান্তরে চ'লে যায়,
তার অন্ধ দৃষ্টিপাতে কোথাও বিপুলভাবে পাতা খ'সে পড়ে-
তোমরা যে যার মতো চ'লে গেছো। আমি জেগে উঠে

তোমাদের প্রতিটি কথার মানে বুঝে নিই। পাথরে
পাথর ঠুকে, জেবলে ধরি আলো ॥

মাঝরাতের কবিতা

মাঝরাতে, অর্ধেক বেলুন, এই চাঁদ দেখে
কোথাও আড়ালে গিয়ে হাঁফ ফেলবার সাধ হয়।
ক্রমশ চঞ্চলভাবে আলোছায়া নিজের নিজের কাজ
গুছিয়ে এনেছে। তীক্ষ্ণ শিসে পাখি বলে
"সে-ও আছে, সেও কিছু জানে"।
মাঝরাতে, আলো ও আঁধার, আঁধার ও আলোর খেলা দেখে
আমি চমকিয়ে উঠি, তারপর স্বস্তি খুঁজি ব'লে
মশারীর সিল্যুয়েতে প্রিয় রমণীকে, দেখি,
ঘুমিয়ে রয়েছে।
আমি কেন ঘুমোতে পারি নি, ঠিক বুঝতে পারি না।
চাঁদ কি শাসন করে আমাদের ? নাকি আমরা
তততোটা শাসিত নই ? শুধু দৃশ্যের কাঙাল।

বৃষ্টি নামুক

একদিন হাওয়া কম, আরেকদিন যেন কিছু বেশি,
আরেকদিন আরো বেশি হাওয়া,
ধুলো ওড়ে, ধুলো ওড়ে, ধুলোর ঘূর্ণি শুধু ওড়ে।

মানুষেরই তৈরি ধুলো, মানুষেরই তৈরি আঁধিঝড়,
চোখেমুখে ঝাপটা লাগে ; সমস্ত শরীর
গরিব পোষাক প'রে নেয়।
কারা এতো ধুলো করে ? কেন করে ? কিভাবে বা করে ?
কতোটা ব্যর্থ হ'লে মানুষ এভাবে সব
উল্‌টে পাল্‌টে দিতে চায়।
ঢেকে দিতে চায় সব ? ধুলোর পাহাড় তুলে
ধুলোর পাহাড় ভেঙে দেয় ?

আহা, বৃষ্টি নামুক আজ তৃষিত মাটিতে—
মানুষ দেখুক, কিভাবে সেগুন-বাকল সব
জলে ছলোছল ক'রে তাকিয়ে রয়েছে।
মানুষ দেখুক !!

হে পুরনো মাটি

অন্ধকার, হে পুরনো মাটি, তুমি শোনো,
আমরা এখনো যারা কাছে পিঠে দাঁড়িয়ে রয়েছি
তাদের সমস্ত সংকেত তুমি ব'লে দাও।
চূর্ণি নদী কচুরিপানার নীল ভাসিয়ে ভাসিয়ে
কালভার্ট পেরিয়ে চ'লে গেছে।
সাইকেল, ছাগল, আর মানুষেরা একই নৌকোয় আজ পারাপার করে—
হে পুরনো মাটি, দ্যাখো, তোমার আদিম গন্ধ
আতর-ঝাপটার মতো সমস্ত শরীর যেন ছড়িয়ে পড়েছে,
তুমি শুধু ব'লে দাও, এর পরে কখন কোথায় যেতে হবে,
তুমি শুধু ব'লে দাও, আমরা কিছুটা জেনে
তারপর, বাড়ির দিকের রাস্তা খুঁজে পাবো কিনা।

অন্ধকার, হে পুরনো মাটি, তুমি শোনো ॥

চৈত্রে, অনেক রাত্রে

প্রাণ থেকে প্রাণে সাড়া চলে।
চৈত্রে, অনেক রাত্রে, বাঁশ-পাতা শব্দ ক'রে ঝরে।
কে যেন কোথায় সব আমাদের জন্যে শুনে যায়,
নইলে আমরা তো ঘুমিয়ে ছিলাম, প্রথমে তো কিছুই বুঝি নি!
তবু জেগে উঠতে হ'লো। বাইরে, তখন জ্যোৎস্না, নিমেষনিহত
একরকম জোনাকিরা নিভে, জ্ব'লে, নিভে
তারপর স্পষ্ট স'রে গেলো।
যা প'ড়ে রইলো, তা মাঠের ওপরে মাঠে
যোজন যোজন হাওয়া। প্রাণ, আর প্রাণের প্রবাহ।

আমরা যে এইভাবে সাড়া দেবো, তা কখনো
একবারো বুঝতে পারি নি, আমরা যে এইভাবে
মাঝ রাত্রে জেগে উঠে বাইরে তাকাবো, তা-ও
কখনো বুঝি নি। তবু তো টিটিভ, শোনো,
ডেকে উঠলো। একটা চঞ্চল নুড়ি
ছিল্‌কিয়ে চ'লে এলো পায়ের ওপরে।
চৈত্রে, অনেক রাত্রে, আমাদের খেলা শুরু হ'লো ॥

পাতিহাঁস

এই জীবনের মধ্যে কারা যেন পাতিহাঁস ছেড়ে দিয়ে গেছে।
ভোরবেলা থেকে তাই শব্দ ওঠে, খুব শব্দ ওঠে।
শামুক, গুগ্‌লি সব র'য়ে গেছে, মনে হয়,
নইলে এখন এই পাতিহাঁস কেন ?
আমাদের জল এইভাবে ঘোলা হ'য়ে যাবে—
আমরা কি কখনো ভেবেছি ?
কারা এই পাতিহাঁস ছেড়ে দিয়ে গেলো ?

আমরা অনেকটা কাজ শেষ ক'রে, তবে
পুকুরে এসেছি—
এখন জলের রং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হ'লে ভালো হ'তো।
আমরা হয়তো সাঁতার দিতাম, হয়তো বা চুপ ক'রে ব'সে
গাঢ় ছায়াদের সঙ্গে কথা বলতাম নিচু স্বরে।

কারা এই পাতিহাঁস ছেড়ে দিয়ে গেলো ?

ফিরে এসে

ফিরে এসে দেখি, কেউ নেই।
কেউ হয়তো সেইভাবে কখনো ছিলো না—
তবু মানুষজনের সঙ্গে দেখা হ'তো, ঘৃণা ভালোবাসা
হ'তো, মৌচাকে ফোঁটা ফোঁটা মধু জমতো সহজ নিয়মে,
বাসে চ'ড়ে, চলে আসতো তরুণ কবির দল
একঝাঁক মৌরলার মতো।
এখন, দুদিন আমি বাইরে গিয়েছি, কেউ নেই।

এখন আয়নার সামনে ব'সে আছি।
ছায়া পড়ে। আমারই তো ছায়া !
গাছগাছালিতে কিছু শব্দ ওঠে, আমি শুনতে পাই।
বড়ো রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক গেলো, আমি শুনতে পাই।
আগে যারা ছিলো, তারা হয়তো সেরকম আপন ছিলো না।

নইলে তারা কেন চ'লে গেলো ?
আমি যে ওদেরই জন্যে কিছুদিন বাইরে গিয়েছি
ওরা বুঝলো না কেন ?

এর পরে যারা আসবে, তারা যেন
আরো কিছু স্থায়ীভাবে আসে ।

আমি ফিরে এসেছি, মানুষ

মুকুটমণিপুর

প্রথমে দু'চোখ প্রায় বন্ধ থাকে ;
তারপর চোখে ঘোর লাগে, চোখ খোলে ।
অযুত নিযুত বর্ষ খেলা করে কংসাবতীর ধারে ধারে ।
ভয় কি মাখানো আছে পাথরে পাথরে ? কার ভয় ?
বোল্ডার সরিয়ে দিয়ে বাঁধ বরাবর নদী এগিয়ে এসেছে ।
একদিক খুব শুকনো, অন্যদিকে জল জমে আছে ।
বাঁকুড়ার বাস এসে ডাকবাংলোর পাশে থেমে গেলো একা ।

সমস্ত মুকুটমণিপুরে এতো ছায়া এইভাবে খেলা করে কেন ?
গোল ডাকবাংলো যেন উড়ে-আসা পাখির মতন বসে আছে ;
ঠিক চ'লে যাবে ।
রাত্রে, সুদূর অস্থি, বাঁধ শুধু জেগে থাকে নিচে ।
কোথাও কি ভুল হয়েছিলো ? টুরিস্ট-অফিস সব জানে ?
অযুত নিযুত বর্ষ খেলা করে কংসাবতীর ধারে ধারে ॥

দুঃখের শিকার

হঠাৎ, চকিত লাফে আমাদের দুঃখের শিকার ধ'রে ফেলি ।
লোভ নয়, ক্ষুৎপীড়নের তাড়া নয়, নয় ক্রোধ,
যেন মায়ার বাঁধনে এই চরাচর বাঁধা আছে, লতাগুল্মময়
বনের ভেতরে আজ দুঃখের শিকার তাই জালে পড়ে ।

কতো দীর্ঘদিন ধ'রে আয়োজন ছিলো, ভেবে দ্যাখো !
পথের ভেতরে পথ সূঁচ দিয়ে কারা গেঁথে গেছে ?
আমাদেরও তাবু ফেলতে হয়েছিলো মাঠের ওপরে ।
আগুন জ্বালিয়ে কিছু নাচগান, আবার সকাল হ'লে সামনে বেরোনো ।

এখন, গভীর বনে, সবুজ-হলুদ একাকার ।
এখন, গভীর বনে, ঝর্ঝর পাতা ঝ'রে পড়ে ।
হঠাৎ, চকিত লাফে আমাদের দুঃখের শিকার ধ'রে ফেলি ।
এতো মায়া আছে এই পৃথিবীতে ! রাতের লণ্ঠন জ্ব'লে ওঠে ।।

অন্ধকারে উড়ন্ত ট্রাপিজ

প্রথমে আলোই ছিলো ; তারপর অন্ধকার হ'লো !
ন্যাশনাল সার্কাসের ট্রাপিজ-দড়ির নিচে
নীল মশারির মতো ঘেরাটোপ জুড়ে
ছোপ ছোপ অন্ধকার, আলো ।
শূন্যে যারা সাঁতার কাটার মতো দুহাত বাড়িয়ে
দিক থেকে দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে
খেলা করছিলো, তারাও তো মানুষ মানুষী ? নাকি নয় ?
জরির পোষাকে শুধু আলো জ্বলছিলো, মৃদু আলো,
সমুদ্রের খুব নিচে যেন মাছের শহর, তারা-মাছ,
আর কোনো হাওয়া নেই, শুধু খেলা, চংক্রমণ, খেলা .....
ওরা স্পর্শ ক'রতে চেয়েছিলো নিজেদের ?
নাকি শুধু ত্রিভুবন সাক্ষী রেখে
এক প্রান্ত থেকে শুধু আরেক প্রান্ত ছুঁয়ে
চঞ্চল আত্মার মতো ঘুরে মরছিলো ?
পেছনে ব্যাণ্ডের বাজনা বেজে উঠছিলো তালে তালে,
যারা খেলা করছিলো, তাদের হাত-পা-কোমর-বুক
পাখির উড়াল্ ব'লে মনে হয়েছিলো ।
আমাদের চূড়ান্ত, চঞ্চল খেলা এইভাবে তবে কি আঁধারে ?
সমুদ্রে টাঙানো আছে হাওয়ার মতন লঘু ব্রীজ ।
অন্ধকারে উড়ন্ত ট্রাপিজ ।।

বীজ

নাটকের চরিত্র

ডক্টর ভবভূতি চৌধুরী (মাঝবয়সী অধ্যাপক)
ইন্দ্রাণী চৌধুরী (ভবভূতির স্ত্রী)
ডক্টর অমিয় সান্যাল (স্থানীয় ডাক্তার)
শ্যামল মজুমদার (এঞ্জিনিয়র)

প্রথম দৃশ্য

নভেম্বর। শীতের বিকেল
স্থান-সিউড়ি

(মঞ্চে ইন্দ্রাণী দুহাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। বাঁ পাশ থেকে তার মাঝবয়সী স্বামী ভবভূতি প্রবেশ করলেন।

নেপথ্য থেকে ভাদু গান ভেসে আসছে ঃ

ক্যানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যান্স হলো সারা—
মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।)

ভবভূতি—কলুকে পুড়িয়ে এলাম এইমাত্র তিলপাড়ার শ্মশানে, ময়ূরাক্ষীর ধারে
কলু, আমাদের কলু, ভাবতে পারো আমাদের দশ বছরের সন্তান
যাকে আমরা তিলে তিলে বড়ো ক'রে ভেবেছি যে
একদিন মেয়ের মতো মেয়ে হবে। সে কিনা, এমনভাবে
তিনদিনের কলেরায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলো আমাদের।
ডাক্তারও কিছুই করতে পারলো না ; বললো ঠিকমতো ইঞ্জেকসন
পড়েনি শরীরে।
আমি তার কথা অবিশ্বাস করিনি, ইন্দ্রাণী,
অমিয় সান্যাল আমাদের অনেকদিনের বন্ধু, তাছাড়া এখানে তার
হাতযশ আছে, সে তো সবাই বিলক্ষণ জানি,
তবু কেন, কেন, কেন…

ইন্দ্রাণী—আমি আর পারছি না, ভব,
সব কী রকম যেন শূন্য ঠেকছে, সব অন্ধকার, সব কালো

তুমি যেই গেলে, পাড়ার কয়েকজন এলো সান্ত্বনা দিতে
তারা চ'লে যেতে, সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো
বাজ-পড়া গাছের মতন—
আমি পুরনো অ্যালবাম খুলে দেখছিলাম একে একে
কলুর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হ'য়ে ওঠবার
সব রকমের ছবি—কোনোটাতে হাসছে, কোনোটাতে
বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক ক'রতে গেছে, কোনোটাতে
প্রাইজ নিচ্ছে স্কুলে।
আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, তুমি আগে ক'রতে,
এখন করো কিনা নিজেও জানো না,
কাকে দোষ দেবো, তবে, আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া—
বলো, কাকে দোষ দেবো ?

ভবভূতি—শীতে শুকনো ময়ূরাক্ষীর ঘোলা জল,
আর দু'একটা শকুন এখানে ওখানে ব'সে আছে,
কাঠের গুঁড়ির ওপর ভেসে আসছে কী যে একটা, বুঝতে পারিনি,
দু'তিনটে কুকুর ডাকছে, ডোমগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের হলকা
যেন আরো লাল ক'রে তুলছিলো।
কলু, কলু, শোন্, আমি একবার ডাকলাম, ও উত্তর দিলো না।
সারাটা রাস্তা আমি টলতে টলতে ফিরে এলাম।
শ্যামল সঙ্গে ছিলো, সে কিছুক্ষণ পরে আসবে বলেছে।
ডাক্তারও আসবে, আরো হয়তো কেউ কেউ আসবে যাদের চিনি না।
কিন্তু কল্যাণী চৌধুরী আর কোনোদিন আসবে না এই বাড়ির ভেতরে।

ইন্দ্রাণী—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, এক কাপ চা নিয়ে আসি। প্রস্থান।

ভবভূতি—হাত পা ধোবার ইচ্ছে এখন আর নেই, তাছাড়া ময়ূরাক্ষীর জলে
আমি সমস্ত শরীর প্রায় বারবার ধুয়ে এসে
তবেই উঠেছি।
সন্তানের জন্ম দেয়া তবে কি অন্যায়, কোনো ঘোরতর পাপ,
বিশেষত যে সন্তান অকালে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে ?
কিন্তু আমরা কি করে জানবো, কে আগে শ্মশানে পুড়বে—
সন্তান, না তার পিতামাতা ?
বলো জানবো কি ক'রে ? নাকি জানা যায় ?
যারা জ্যোতিষীতে বিশ্বাস করে, তারা বলে
সব আগে থেকে জানা যায়।
আর জানলেই বা কী হ'তো ?

(কড়া নাড়ার শব্দ)

আসুন, আসুন, বাইরের দরজা খোলা আছে।

(একই সঙ্গে এঞ্জিনিয়র শ্যামল মজুমদার এবং ডাক্তার অমিয় সান্যালের প্রবেশ)

অমিয়—সিউড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে যে, আমি ডাক্তার হ'য়েও
তোমার মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম না, ভবভূতি।
কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, বিশ্বাস করো।
আমি চেষ্টা করেছিলাম কলুকে বাঁচাতে—
কলকাতা হ'লে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। ইঞ্জেকশন,
হয়তো খারাপ ছিলো, তাছাড়া আমি আমেদপুরে গেছিলাম ব'লে
ওষুধপত্র দিতে দেরি হ'লো।
তুমি শক্ত হও, ভবভূতি, তুমি শক্ত হও।

শ্যামল—ইন্দ্রাণী কোথায়, ওর জন্যে সত্যিই মায়া হয়।
তুমি পুরুষ, মানুষ, ভবভূতি, তুমি হয়তো সামলে উঠবে কন্যাশোক-
কিন্তু আমি জানি, বাছুর না থাকলে খড়ের বাছুর তৈরি ক'রে
গাভিনীর সামনে রাখতে হয়, নইলে তার বোঁটা থেকে পীযূষ ঝরে
না। তাছাড়া, কল্যাণী সবে বেড়ে উঠছিলো, যেন লকলকে আমনের
ধান, তাকে কে কাস্তে দিয়ে উপ্‌ড়ে নিলো ? আমরা বন্ধুরা
দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু ক'রতে পারলাম না।
কীই বা কর'বো ভবভূতি !

(নেপথ্য থেকে আবার গানের শব্দ ঃ

কানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যা-ষ হ'লো সারা—
মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।

ইন্দ্রাণীর চায়ের কাপ হাতে প্রবেশ।)

ইন্দ্রাণী— ও তোমরা কখন এলে, ডাক্তার, শ্যামল। তোমরা
চা-টা কিছু খাবে তো, আমি নিয়ে আসছি এখুনি।
আমি ভীষণ, ভীষণ শক্ত হ'য়ে গেছি, অমিয়, শ্যামল।
মনে হচ্ছে, আমি পাথরের তৈরি কোনো স্ফিংস,
কিংবা তা-ও নয়, শুধু পাথরের তৈরি কোনো কঠিন পাষাণ
আমি একটুও কাঁদছি না, বিশ্বাস করো,
আমি একফোঁটা জল ফেলছি না চোখ থেকে।

শ্যামল আর অমিয় দুটি চেয়ারে ব'সতে ব'সতে, একই সঙ্গে ব'লে উঠলো :

(প্রথম লাইনটি বললো শ্যামল, দ্বিতীয়টি অমিয়)

ইন্দ্রাণী, আমরা তোমাদের বন্ধু, ইন্দ্রাণী।
আমরা অনেক দিনের বন্ধু তোমাদের।

ইন্দ্রাণী—(হঠাৎ চিৎকার ক'রে)—কল্লু, কল্লু, কল্লু, কল্লু!
আমি আর পারছি না রে, তুই ফিরে আয়।

ভবভূতি—আস্তে, ইন্দ্রাণী, আমি কী যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
বিদেশীপাড়ার দিক থেকে এসে কলেজের
দিকে এগিয়ে চলেছে।
যেন বাবলা গাছের হাজার হাজার পাতা
ঝড়ের মতন শব্দ ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায়
ভেসে আসছে। কয়েকটা হলুদ ফুল
মাটির ওপরে প'ড়ে আছে, তারাও কি শব্দ ক'রে উঠছে ওখানে?
আস্তে, ইন্দ্রাণী আস্তে, আমাকে সমস্ত কিছু শুনে নিতে দাও।

অমিয়—তুমি কিছুদিন দু'একটা ট্র্যাংকুলাইজার খাও আমি প্রেসক্রিপশন
লিখে দিচ্ছি। নইলে রাত্রে তোমার ঘুম না-ও আসতে পারে।
ইন্দ্রাণী, তুমি তো একদিন বলেছিলে ট্র্যাংকুলাইজার খেলে
পরের দিন সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে!
তোমাকে কী ওষুধ দেবো, আমি বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রাণী—বিষ-ও তো একরকম ওষুধ, তাই না, ডাক্তার।
কতো রকমের বিষ আছে পৃথিবীতে, ভেবে দ্যাখো
কোনো কোনো বিষে মানুষের মৃত্যু হয়, আবার
এমনও তো বিষ আছে, যা তোমাদের ওষুধপত্রে খুব
কাজে লাগে।

শ্যামল—আমি বুঝতে পারছি ইন্দ্রাণী, তোমার কী হয়েছে,
আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তুমি থামো।

ইন্দ্রাণী—ডাক্তার, ডাক্তার, তুমি এই এঞ্জিনিয়র সাহেবের কথা
কানেও দিয়ো না।
বিষ, বিষ দাও আমাকে তুমি এইমাত্র বিষ এনে দাও
আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতাম, একটা সাপ
তাড়া ক'রে আসছে পুকুর-পাড়ের জমি থেকে।
কী সুন্দর, চিক্কণ শরীর, লাল-হলুদের-ছিট-দেয়া, আমি যেই পেয়ারা

পাড়তে গেছি, সে হঠাৎ ফণা তুলে,
সে হঠাৎ ফণা তুলে, সে হঠাৎ ফণা তুলে……
তার পরে কী, আমি মনে করতে পারছি না।

ভবভূতি—ইন্দ্রাণী, পাগলামি ক'রো না, চুপ করো।
তারপর কী, আমি জানি। সে তোমাকে স্বপ্নেও
ছোবল দেয় নি, শুধু তার শরীরের
চকিত বিদ্যুচ্চমক ঝিলকিয়ে স'রে গিয়েছিলো।

শ্যামল—হয়তো কলুও এরকম স্বপ্ন দেখতো।
ডাক্তার, তুমি তো জানো ফ্রয়েড কী বলেছেন স্বপ্ন বিষয়ে।
বিশেষত, সাপের স্বপ্ন যারা দেখে তাদের বিষয়ে।

ইন্দ্রাণী—পাকামি ক'রো না, এঞ্জিনিয়র,
শুধু ডাক্তার কেন, ভবভূতি, আমি তুমি
সবাই ফ্রয়েড পড়েছি। সেটা বড়ো কথা নয়।
কিন্তু আমি কিছুতেই, কিছুতেই মনে করতে পারছি না
স্বপ্নটা কিভাবে শেষ হ'লো…

ভবভূতি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, ইন্দ্রাণী, তুমি আর…

ইন্দ্রাণী—বিষ, বিষ এনে দাও, অমিয়, আমাকে তুমি বিষ এনে দাও।
নীল নক্ষত্রের মতো বিষ, কিংবা খুব লাল, রক্ত চুনির মতন।
আমি খুব সুন্দর জিনিস পছন্দ করি তোমরা তো জানো।
যেমন তেমন বিষ আমি খেতেই পারবো না, বমি করে দেবো।
কিন্তু যদি সুন্দর, খুব সুন্দর কোনো বিষ হয়, সুন্দর বিষ।

অমিয়—বাবিশ। বিষ বিষ করছো কেন, ইন্দ্রাণী।
তোমরা দুজনে তো বেঁচে আছো ভবভূতি, তুমি।
একটি সন্তান গেছে, আরেকটি সন্তানের জন্ম দিতে পারো।
এমনকি বয়স তোমার ?

শ্যামল—ডাক্তার তো ঠিকই বলছে, এমনকি বয়স তোমাদের।
দুঃখ তো পাবেই, সন্তানশোকের দুঃখ কে না পায়, বলো,
কিন্তু যদি আরেকটি ছোট্ট ছেলে কিংবা ছোট্ট মেয়ে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে মেঝের ওপরে,
টিপয় উলটে দেয়, অ্যাশট্রের ছাই দেয় ছড়িয়ে টেবিলে,
তাহলে আবারো হয়তো ভালো লাগবে তোমাদের।
বিশেষত তোমার, ইন্দ্রাণী।

তুমি আড্ডা দেবার ফাঁকে ফাঁকে পশমের জামা বুনবে,
কখনো বা কোলে নেবে ছোটোটিকে,
তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভবভূতি—ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, ইন্দ্রাণী, শ্যামল, অমিয়,
ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।
শুধু আজকের ধকল বা যন্ত্রণার জন্যে নয়,
কিছুদিন ধ'রেই এক অবসাদ ঘিরে থাকছে
আমার শরীর।
যেন কচুরিপানায়-ঢাকা এক ডোবার ভেতরে
আমি আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছি, চারপাশে কাদা, ফেনাজল
দুহাত ওপরে তুলে আমি বলতে চাইছি "বেঁচে আছি."
কিন্তু কখন যেন পা হড়কে গেছে—
আমি আর ঠিক উঠতে পারছি না,
আমার ইন্দ্রিয়···যাক, বড়ো ক্লান্তি, বড়ো শোক।

অমিয়—তুমি একটা ট্র্যাংকুলাইজার খাও, ভবভূতি।
নোট বই লিখে লিখে তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো
গত তিন বছর। উপার্জন অনেক করেছো, যাতে কলেজে পড়াতে আর না হয়।
তারপর আজকের এই দুর্ঘটনা! তোমার স্নায়ু কি আর ঠিক থাকতে পারে!

শ্যামল—শুধু ভবভূতির কথা কেন ভাবছো, ডাক্তার,
স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তুমি একটা কিছু ওষুধ-পথ্য দিয়ে যাও
আজ রাত্রে ওরা যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

ইন্দ্রাণী—বারে! কে এখন ট্র্যাংকুলাইজার খেতে যাবে।
আমি আজ জেগে থাকবো, জেগে থাকবো, সারা রাত জেগে
দেখবো আমার বুকের ভেতরটা আজও দপ্‌দপ্ করে ওঠে কিনা
আজ তো জ্যোছনা, তাই না? জ্যোছনা খুব ভালো—
কী, তোমরা অমন বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে
কী ভাবছো, বলো তো!
ভাবছো, আমি আবোলতাবোল বকছি, ভাবছো, আমি
হয়তো পাগল হয়ে গেছি।

ভবভূতি—না, তুমি পাগল হওনি। কিন্তু তুমি ক্লান্ত হওনি
কেন, বুঝতে পারছি না।

লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ব্র্যান্ডি খেয়েছো কিনা, আমাকে বলোতো!
যদি থাকে, আমাকে একটু দাও, প্লিজ, একটু দাও।

অমিয়—না, না, খবর্দার নয়। ট্র্যাংকুলাইজারের সঙ্গে
মদ clash করবে। কখনো ছুঁয়ো না।

ইন্দ্রাণী—না, না, না, আমি কিছু ছোঁবো না।
কাকে ছোঁবো, বলো, কাকে ছোঁবো?
বরং ছোবল দেবো, তোমরা সাবধান। দূরে থেকো।
যাও, চলে যাও, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে যাও।
যদি পারো, ডক্টর ভবভূতি চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে
তোমাদের তাসের আড্ডায় গিয়ে ব'সো।

ভবভূতি—আমি কোথাও যাব না, ইন্দ্রাণী। আমি বড়ো ক্লান্ত। শুতে চলো।
অমিয় এবং শ্যামল—আমরা চল্লাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফেব্রুয়ারি

ইন্দ্রাণী— প্রায় চারমাস হ'য়ে গেলো, কলু আমাদের ছেড়ে গেছে।
আমি তো আরেকটি সন্তান চাই, ডাক্তারও তো
তাই বারবার বলছে, তবু তুমি কোনো কিছু কানে তুলছো না।
এমনকি আমার সঙ্গে শোও না পর্যন্ত আজকাল।
শ্যামল, আর ডাক্তার আসছে যাচ্ছে, আমাদের সত্যি বন্ধু ওরা,
আচ্ছা, মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে উঠে তুমি প্রায় পা হড়্‌কে
পড়ে যাচ্ছিলে, তাই না?
কী, এতো গম্ভীর কেন? একটুও যে হাসো না আজকাল!

ভবভূতি—আমি বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি, ইন্দ্রাণী, আমি ক্রমশই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।
শরীরে তেমন আর জোর পাই না. ডাক্তারকে সমস্ত খুলে বলেছি।
সে আমার চিকিৎসা করছে, অনেকরকম ওষুধ, ইন্‌জেকশন দিয়ে
আমার যৌবনকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না।
শুধু অমিয় সান্যাল কেন, আমি কলকাতায় গিয়েও
অনেক স্পেশালিস্ট দেখিয়েছি, তাঁরাও ওষুধ দিয়েছেন,
কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

ইন্দ্রাণী—কী যা-তা বকছো, তুমি এ-বয়সে বুড়ো হবে কেন?
আজ রাত্রে আমরা আবার প্রেম কর'বো, কেমন,

যেরকম আগে করতাম।
আমি একটু রোগা হয়ে গেছি, তাই নয়,
আমাকে তোমার আর ভালো লাগছে না!
রোজ আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু একটু ক'রে দেখি
যোগ-ব্যায়াম ক'রবার কিছু পরে, স্নান সেরে এসে
তোয়ালে জড়িয়ে, আমি নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করি।
একটু রোগা হ'য়ে গেছি হয়তো, কিন্তু আমার শরীর, মন
খুব তাজা আছে।
বলো তো, স্কিপিং ক'রে দেখাতে পারি তোমার সামনেই
জানো, নিজেকে কখনো কখনো একটা নুয়ে-পড়া
বেতস গাছের মতো মনে হয়, যেন জলের ওপরে ঝুঁকে আছি!
তুমি সেই জল, অথচ তোমার নাগাল আমি আজকাল
পাচ্ছি না, ভবভূতি।

ভবভূতি—হয়তো ছিলাম জল একদিন, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,
হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে উঠে টল্‌টল ক'রে উঠতাম কখনো,
কিন্তু এখন আমি শুকনো ডোবার মতো পড়ে আছি,
তুমি বিশ্বাস করো, আমার যৌবন আর নেই,
আমি আর সন্তানের পিতা হ'তে পারবো না।

ইন্দ্রাণী—না, না, না, আমি আর শুনতে চাই না এসব।
আমি সন্তান চাই, যে ক'রেই হোক, আরেকটি সন্তান।
কলুর ছবির সামনে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকি।
ওর শূন্যস্থান কোনোদিনই পূর্ণ হবে না, তবু আমি
আরেকটি ছেলে কিংবা মেয়ে চাইছি, ভব।
নইলে বন্ধ্যা মাঠের মতো ফেটে টুকরো হয়ে
আমি হয়তো ধুলোবালি হ'য়ে যাবো, কোনোদিনও
একটা ফুল-ফুটবে না আমার ওপরে,
একটা তৃণ-ও গজাবে না।

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ)

কে? কে? মনে হয় ডাক্তার বা শ্যামল এসেছে!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ভবভূতি—ইন্দ্রাণীকে আমি সব খুলে ব'ল্লাম, ডাক্তার।

ও কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চাইছে না, আমি প্রায় বুড়ো হ'য়ে গেছি
তোমরা তো বন্ধুও, ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লবে ডাক্তার,
ইন্দ্রাণী সন্তান চায়, আমারও অনিচ্ছা নেই, কিন্তু আমি অপারগ।
ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, শোনো, ডাক্তারকে সব কিছু খুলে বলতে দাও।

অমিয় (চেয়ারে ব'সতে ব'সতে —তোমরা তো একটা ছেলে কিংবা মেয়ে
পালন ক রতে পারো। কলকাতায় গিয়ে…

ইন্দ্রাণী—চুপ ক'রো, আমরা adoption-এ বিশ্বাস করি না।
তা'হলে ভব যা বলছে, সব সত্যি ও বুড়ো হ'য়ে গেছে।
কেন, কেন, কেন, কেন, আমাকে বুঝতে দাও, আমাকে
সমস্ত কিছু বুঝে নিতে দাও।

অমিয়—আমি অনেক চেষ্টা করেছি, ইন্দ্রাণী।
আমার যা বিদ্যে ছিলো, তা তো কাজে লাগিয়েছি,
কলকাতায় গিয়ে ওকে বিশেষজ্ঞদের কাছে নিয়ে গেছি,
কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, কিছুতেই কিছু হয় নি,
শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হ'লো এই দু'তিনমাস ধ'রে—

ভবভূতি—টাকা কিছু গেছে, তা যাক। সেটা বড়ো কথা নয়।
কিন্তু আমি আর পিতা হ'তে পারবো না, কারো সঙ্গে
সঙ্গম কর'তে পারবো না, এই যন্ত্রণা আমাকে
কুরে কুরে খাচ্ছে, অমিয়।
তাছাড়া, কলুটা যদি বেঁচে থাকতো, তাহ'লে
বাড়িঘর অন্যরকম মনে হ'তো। আমার ব্যর্থকাম
আমি বাৎসল্যে ভরিয়ে দিতাম!
তারপর একদিন ও আস্তে আস্তে বড়ো হ'তো
ঝলমলে গাছের মতো। আমের বউল ফুটতো,
প্রজাপতি উড়ে আসতো গাছের ওপরে।

ইন্দ্রাণী—আমি নিঃসন্তান হয়ে থাকতে পারবো না, ডাক্তার।
আমি চাই আমার রক্তের মধ্যে আস্তে আস্তে গ'ড়ে ওঠা
একটি শিশুর অবয়ব, যাকে ন'মাস কি দশ মাস গর্ভে ধরে
আমি আনবো পৃথিবীতে।
আবার আমাকে কেউ মা বল'বে, আবার আমাকে ঘিরে
বেড়ে উঠবে লতার মতন কিছুদিন।

(শ্যামলের নিঃশব্দ প্রবেশ)

শ্যামল, তুমিও কি জানো, তোমাদের ডক্টর চৌধুরী
একেবারে বুড়ো হ'য়ে গেছে ? আমাকে সন্তান আর দিতে পারবে না
কোনোদিন। বলো তুমি জানো ?

শ্যামল—হ্যাঁ, আমি সমস্ত জানি, ইন্দ্রাণী, সব কিছু জানি।
ডাক্তার আমাকে সব খুলে বলেছে, চৌধুরীও বলেছে।
কল্লু চ'লে গেলো, তারপর আরেক দুর্ভাগ্য এসে ধর'লো তোমাদের।

ইন্দ্রাণী—নড়নড়ে নড়বড়ে গা
চলে যা, তোরা চলে যা,
ফুটি-ফাটা কাঠ, ফুটি-ফাটা
কখন যে হ'য়ে গেছে কাটা,
ছিলো আগে, এখন তো নেই,
পড়ে আছে খড় সামনেই,
নড়বড়ে, বড়ো নড়বড়ে…

ভবভূতি—তুমি কি ডাইনীর মন্ত্র পড়ছো, ইন্দ্রাণী ?
তোমার কী হয়েছে, আমি এতদিন তোমার সঙ্গে থেকেও
আর বুঝতে পারছি না তোমাকে।
তুমি যা চাইছো, তা তো তোমাকে এখন
আমি আর দিতে পারবো না।
কিন্তু তা নিয়ে এতো দুঃখ করছো কেন, আমি বুঝতে পারিনা।
বাড়িতে বইপত্র আছে, আমি আছি, শ্যামল, অমিয়,
দুজনেই তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু তুমি উন্মাদের মতো
সন্তান সন্তান ক'রে মরছো।

ইন্দ্রাণী—তুমি তা বুঝবে না, ডক্টর চৌধুরী।
সারাদিন পড়াশুনা নিয়ে থাকো, নোটবই লিখে বড়োলোক হয়েছো,
টাকা পয়সার কোনো চিন্তা নেই।
আর আমাকে লুকিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলে,
প্রথমে ডাক্তার জানলো, পরে শ্যামল মজুমদার, সবশেষে আমি।
আর তারপর ? শূন্য শুধু শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শিস-দেয়া হাওয়া
বাইরের উঠোন থেকে ঘরের ভেতরে, আর ঘরের ভেতর থেকে বাইরের বাগানে,
আসা-যাওয়া করছে।
তুমি তো অনেক শব্দ শুনতে পাও, ডক্টর চৌধুরী,

শূন্যের চিৎকার কখনো কান পেতে শুনেছো কি ?
জানো, বুকের ভেতর হিম হ'য়ে গেলেও
তবু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।
কেন ইচ্ছে হয়, কিছু জানো ?

ভবভূতি—তুমি তার চেয়ে ইতুলক্ষ্মী, বা ষষ্ঠীর পুজো দাও।
দ্যাখো কিছু করতে পারো কি না,
আপাততঃ আমাকে একটা বার্মিজ চুরুট খেতে দাও তো
(চুরুটে টান দিয়ে) আঃ, কী আরাম।

শ্যামল—সত্যি, ইন্দ্রাণী, তুমি বড়ো সীরিয়স কথাবার্তা বলছো
একটু সহজ হও তো, যদি বলো, আমার বাড়িতে
এক বোতল দামী হুইস্কি আছে, নিয়ে আসি।

অমিয়—শ্যামল ঠিকই বলছে, একটু ড্রিংক করা যাক
তোমাদের ঘরে ব'সে। আমার অবশ্য তিনপেগ লিমিট,
তাই বা কম কি ?

ইন্দ্রাণী—অ, একটু লাইট মুডের কথাবার্তা চাও।
তা মন্দ কি, বলো তো, একটু খ্যামটা নেচে
তোমাদের entertain করি।
এককালে ভালো নাচতাম, কিন্তু খ্যামটা নয়, ভারতনাট্যম।
আশুতোষে যখন পড়তাম, তখন একটা বা দুটো
মেডেলও পেয়েছিলাম নৃত্যগীত ক রে।
তারপর তোমাদের এই মফঃস্বল শহরে এসে··

ভবভূতি—কী, থামলে যে !

ইন্দ্রাণী—না, আমার কষ্ট হচ্ছে। আবার যন্ত্রণা
পাইথনের মতো পাকে পাকে
জড়িয়ে ধরছে আমাকে।
কোনো মুক্তি নেই, ডক্টর চৌধুরী, ডাক্তার শ্যামল,
আমার এখন কোনো মুক্তি নেই আর।
কাকে হাহাকার বলে, তা আমি শুনতে পাই, কখনো বাইরে, আর
কখনো ভেতরে।
না, ড্রিংক-ট্রিংক আর নয় আমাদের ব'সবার ঘরে—
মদ খেতে যাবো কেন শুধু শুধু ? আমার তো আপাদমস্তক
নেশায় চুর হ'য়ে আছে।

দ্যাখো, আমি আর পা ফেলতে পারছি না।
ডানদিকে যাবো ভাবছি, চলে যাচ্ছি তখনি বাঁ-দিকে।
বাঁদিকের শোবার ঘরে যেতে গেলে, শুধু ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে
দাঁড়িয়ে পড়ছি।
আগে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে, মেজে থেকে
মোজা বা রুমাল ওপরে তুলতে পারতাম,
ভবভূতি খ্যাপাতো আমাকে, ব'লতো prehensile toe—
কিন্তু এখন আমার শরীর আর আমার আয়ত্তে নেই।

অমিয়—সামনেই আমি আছি, ইন্দ্রাণী, আমি পেশায় ডাক্তার।
তাছাড়া, চৌধুরী আর তোমার বন্ধু—
তোমার কী হয়েছে আমি জানি, এখুনি ওষুধ দিচ্ছি,
খেয়ে নাও।
তারপর ঝরঝরে শরীর নিয়ে দেখাও না ভারতনাট্টম,
কিংবা খ্যামটা, কিংবা তুমি যাকে আগে নকল ক'রতে
সেই বাচ্চা বাউলটার "ও ভোলা মন" স্টাইলের
ঘুরং ঘুরং নাচ।

শ্যামল—বলো তো আমি বৈরাগী সাজবো তুমি বৈরাগিনী।
ভবকে নাহয় ছেড়ে দাও, ডাক্তারেরও footsteps ভালো নয়,
জানো আমি পেনসিলভানিয়ায় একমাস
ট্যাপ-ড্যান্স শিখেছিলাম।
ড্যানি কে র মতো নাচতে পারতাম, মনে হয়।
চন্দ্রদাস না পূর্ণ দাস, ওদের নাচের স্টেপ এমন কি কঠিন?

ভবভূতি—বেশ তো, ইন্দ্রাণী, তুমি শ্যামলের সঙ্গে
ট্যাপ্-ডান্স বা বাউল-নৃত্য বা অন্য কোনো ঢঙের নাচ
আরম্ভ করো।
শুধু বেশি শব্দ ক'রো না, পাড়া-পড়শী
আমাদের মতো enlightened নয়।
তারা জানলায় ঢিল ছুঁড়তে পারে।

(নেপথ্য থেকে আবার গান ভেসে এলো :)

ক্যানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যাম্প হ'লো সারা—

মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।)

ইন্দ্রাণী—কে, কে ধানের বীজ নষ্ট হবার গান গাইছে।
আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ভবভূতি।
এটা তো ফেব্রুয়ারি মাস, ধান কাটা হয়ে গেছে নভেম্বরে,
তাহ'লে এই অলক্ষুণে গান কারা গাইছে?
আমি জানি, বীজ নষ্ট হ'য়ে গেলে, আর গজাতে পারে না।
বীজ নয়, বীজন ধানের চারার সার সার বীজন ক্ষেত জুড়ে।
সত্যি, বীজ কাকে বলে আগে কখনো কি এভাবে ভেবেছি?
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বীজের বিদ্যুচ্চমক কেঁপে ওঠে,
আমার তো বায়োলজি ছিলো, কেমিষ্ট্রিও কিছুটা পড়েছি,
আমি জানি পুরুষের রক্ত কিভাবে বীজে পালটে যায়—

ভবভূতি—তার জন্যে বায়োলজি, কেমিষ্ট্রি পড়বার দরকার হয়না, ইন্দ্রাণী।
একটা বয়ঃসন্ধির বাচ্চাছেলেও এই সব কথা জানতে পায়।
তোমার কি হয়েছে বলো তো, মাঝে মাঝে চমকে চ'মকে উঠে
ট্রাজেডির নায়িকার মতো স্পীচ দিচ্ছো।
একবার আমার কথা কি তুমি ভেবে দেখেছো? আমিও তো পুরুষ,
কল্যাণীকে আমিই জন্ম দিয়েছিলাম, তুমি গর্ভে ধরেছো,
এখন এই মাঝবয়েসের শুরুতেই আমার যৌবন
বিদায় নিচ্ছে, ঘোর লাগা সূর্যাস্তের মতো পাহাড় চূড়ায়,
আমি তবুও তো চাইছি সব শান্তভাবে মেনে নিতে,
মেনে নিতে আমার ভাগ্য, মেনে নিতে পরিপার্শ্ব, সব,
আর তুমি চেঁচিয়ে মরছো উন্মাদের মতো।

ইন্দ্রাণী—(ঠোঁটে আঙুল দিয়ে)—চুপ। একটু চুপ করো! একটাও কথা ব'লো না তোমরা। চুপ।
কী যেন একটা গজিয়ে উঠছে আমার পেটের ভেতরে,
তার নাড়ির শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি।
ঠিক শব্দ নয়, জানি আমার গর্ভে কারো জন্ম হচ্ছে না,
কিন্তু যা হ'তে পারে, তার সম্ভাবনা যেন
তিরতির ক'রে ক্রমশ ওপরে দিকে উঠে আসতে চাইছে।
অস্ফুট একটা শব্দ, বুঝলে, যেন দেয়ালের
ছোটো একটা গর্ত দিয়ে, ফিশ ফিশ ক'রে হাওয়া বইছে।

আমি মাঝেমাঝে শুনতে পাচ্ছি, কখনো পাচ্ছি না,
তবু মনে হয়, আরো একটু ভেতর দিকে কান পাতলে
ঠিক শুনতে পাবো।
চুপ। দোহাই তোমাদের, একটু চুপ করো। চুপ।

অমিয়—চৌধুরী, আমার মনে হচ্ছে ইন্দ্রাণী কোনো একটা সাইকোসিসে
ভুগছে।
(ভবভূতির কাছে গিয়ে, একটু নিচু গলায়)
ওকে কলকাতায় নিয়ে কোনো সাইকেট্রিস্টকে দেখাতে হবে।
যদি বলো, আমি ডক্টর মজুমদারকে লিখে
একটা appointment ক'রে রাখি।
তুমি তো জানোই ডক্টর ঝুলন মজুমদার খুব বড়ো সাইকেট্রিস্ট।

ভবভূতি—কলকাতায় একজনও সাইকেট্রিস্ট নেই—
ঝুলন মজুমদার-টজুমদারকে আমি চিনি না, চিনতেও চাই না।
অনেকদিন আগে, কলকাতায়, আমার একবার
nervous breakdown হয়েছিলো, আমি এক সাইকেট্রিস্টের কাছে
গিয়ে যা নাকাল হয়েছি, তা তোমাকে আর ব'লতে চাইনা, ডাক্তার।

শ্যামল—ডাক্তার, চৌধুরী যা বলছে, তা হয়তো ঠিক।
এসো, আমরাই অন্যভাবে ইন্দ্রাণীকে এই fixation থেকে
divert করি। তুমি তো জানোই, ও কতো আধুনিক,
আর কতো প্রাণোচ্ছল মেয়ে—
কলুকে হারানোর দুঃখ, আর চৌধুরীর অকাল-বার্ধক্য
ওকে আগুনের হল্‌কার মতো পুড়িয়ে মারছে।
আমাকে একটু সময় দাও, আমি একটা কিছু
ভেবে বার ক'রবো।
ওষুধপত্রে ওর কাজ হবে ব'লে মনে হয় না,
ওর অন্য কিছু চাই।

অমিয়—হয়তো তুমিই ঠিক বলছো, কিন্তু আমি তো ডাক্তার,
সব অসুখেই একটা diagnosis, আর তারপরে
ওষুধের ব্যবস্থা ক'রতে চাই।
আমার দোষ নয়, এঞ্জিনিয়রসাহেব,
এটা হ'লো পেশাগত অভ্যেসের দিক,
কিন্তু আমি তো শুধু ডাক্তার নই, মজুমদার,
আমিও ইন্দ্রাণীর বন্ধু। ওকে আমিই

বাখ, বেটোফেন, রাখমানিনভ শিখিয়েছি।
এই তো মাস ছয়েক আগে, গ্রেগোরিয়ান চার্ণ্ট নিয়ে
আমাদের মধ্যে তর্ক হলো।
ও জিতলো, না আমি জিতলাম, মনে নেই,
কিন্তু…যাই হোক, খুব ভালো কেটেছিলো
একটা বিকেল, এঞ্জিনিয়র।

(মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হ'য়ে এলো। একপাশ থেকে ভবভূতি, অন্যদিক থেকে শ্যামল নিঃশব্দে উইংসের আড়ালে চ'লে গেলো ! ফ্ল্যাশ-ব্যাক।)

ইন্দ্রাণী - না, না নাইন্‌থ সীম্ফণী নয়, প্যাস্টোরাল খুব ভালো
লাগে। দাঁড়াও, আমি স্টেরিও তে আরেকবার প্যাস্টোরাল
দিয়ে আসছি, তুমি মন দিয়ে শোনো
(এক মিনিটের জন্যে, ইন্দ্রাণী উইংসের আড়ালে গেলো, আর বেজে
উঠলো বেটোফেনের প্যাস্টোরাল।)
জানি, ডাক্তার, তুমি আমার চেয়ে Western Music
ঢের বেশি বোঝো।

অমিয়—চুপ করো, তোমার প্রিয় বাজনা মন দিয়ে শুনতে দাও।
(মিনিট তিনেক বেটোফেনের প্যাস্টোরাল বেজে চললো, তারপর

ইন্দ্রাণী—যেন জল, হাওয়া, গাছ, মাটি, ফল
চারপাশে ছড়ানো রয়েছে। মাঝখান দিয়ে
সরু সরু পা ফেলে পা ফেলে মানুষ চলেছে,
কতোরকমের মায়া আছে পৃথিবীতে, কতোরকমের ভালোবাসা··

অমিয়—আরো একটু কাছে এসো, ইন্দ্রাণী, আরো একটু কাছে এলে
তোমাকে আমার ভালোবাসা আরো একটু স্পষ্টভাবে জানাতে পারবো।

ইন্দ্রাণী (হেসে) তোমার আর শ্যামলের এই এক অসুখ, ডাক্তার,
একটু সুযোগ পেলেই, আমাকে চুমু খেতে চাও।
ভব কলকাতায় গেছে, শ্যামল এখন ধানবাদে,
আর এই ফাঁকে, গানবাজনা শেখানোর ছল ক'রে
তুমি চাইছো আলটপ্‌কা প্রেম ক'রে নিতে।
একটু control করো নিজেকে, অমিয়,
আরো একটু control, কেমন !

অমিয়—আমি যদি চুমু খাই তোমার ঠোঁট কি উবে যাবে ?
তাছাড়া, চুমু তো আমি আগেও খেয়েছি, নতুন কিছু না,

তাহলে আজকে এতো ছটফট করছো কেন ?
বলো, আমাকে উত্তর দাও।

ইন্দ্রাণী—কটা বাজে, সেদিকে খেয়াল আছে।
এখ্খুনি ইস্কুল থেকে কল্লু আসবে, তাছাড়া
চৌধুরীর দুজন ছাত্রের আসবার কথা আছে।
তার চেয়ে, তোমার প্রিয় নাইনথ সীম্ফনী দিচ্ছি
স্টেরিওতে, মন দিয়ে শোনো

অমিয়—না, না, সত্যিই বাইরে কাদের যেন পায়ের শব্দ
শুনতে পাচ্ছি। আজ উঠছি বরং—
কাল নয়, পরশু আবার আসবো দুপুরবেলায়।

(ডাক্তার উঠে চ'লে গেলো।)

ইন্দ্রাণী—যেন পাহাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে তুলোর পেঁজার মতো
গলায়-ঘন্টা-পরা একপাল ভেড়ার শাবক আস্তে আস্তে চলেছে কোথায়,
আর উপত্যকা থেকে হঠাৎ পাগল হাওয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়লো গাছ-পালায়
প্যাস্টোরাল, প্যাস্টোরাল, চারপাশে ছড়ানো সকাল প'ড়ে আছে।

(একটু থেমে)

যাই, একটু বাইরে যাই। দেখি কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দরজার দাঁড়িয়ে।

(আলো আস্তে আস্তে ম্লান হ'য়ে, আবার জ্বলে উঠলো। এক ফাঁকে ভবভূতি আর চৌধুরী এসে, তাদের চেয়ারে ব'সে পড়েছে।)

শ্যামল—আমিও ইন্দ্রাণীর বন্ধু, ডাক্তার।
তোমার মতোই ঘনিষ্ঠ, তোমার মতোই
ভবভূতি ইন্দ্রাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী আমি।
চৌধুরী ইন্দ্রাণীকে সাইকেট্রিস্টের কাছে পাঠাতে চায় না,
আর তার কারণও তো জানিয়েছে বিস্তৃতভাবে।
আমার তো মনে হয়, কিছুটা সময় চ'লে গেলে
আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে আসবে।
আবার নতুনভাবে বেঁচে উঠবে ইন্দ্রাণী চৌধুরী—
আজকে বরং চলো, আমার সঙ্গে উঠে পড়ো
ভবভূতি, ইন্দ্রাণীকে একা থাকতে দাও

অমিয়—ঠিক আছে, চলো

ভবভূতি—একটা বার্মিজ সিগার নিয়ে যাবে নাকি, শ্যামল।
ডাক্তারের তো এ সব বালাই নেই।

শ্যামল—না, থাক, এখন আর ইচ্ছে করছে না

ইন্দ্রাণী (বিড় বিড় ক'রে)—

জটি বুড়ি, জটি বুড়ি, জটি বুড়ি
আমি নই তোর মতো থুত্থুরি,
ডানা আছে, করি তাই ঘোরাঘুরি,
জটি বুড়ি, জটি বুড়ি, জটি বুড়ি···
(আস্তে আস্তে পর্দা নেমে এলো।)

তৃতীয় দৃশ্য

মার্চ-এপ্রিল

ইন্দ্রাণী—আমি একটা উপায় ভেবেছি বুঝলে, ভবভূতি।
তুমি তো নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত ব'লে মনে করো, আর সত্যিই তো আলোকপ্রাপ্ত তুমি।
আর আমি? আমি হয়তো সব কিছু তেমন বুঝি না। মাঝে মাঝে অন্ধকারে থাকি। জানো, মাঝরাতে পাশের বাড়ির করোগেডের ছাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে, যে রকম আঁধার মেশানো শব্দ শোনা যায়, আমি অনেকটা
তেমন ঘোরে থাকি।
তবু আমিও তো, আমিও তো enlightened। তাই না, ডক্টর চৌধুরী

ভবভূতি—তুমি enlightened কি enlightened নও, তা নিয়ে
হঠাৎ আবার বকবকানি শুরু করলে কেন?
বলো, কি বল'তে চাও, স্পষ্ট ক'রে বলো?
কী জানতে চাও?

ইন্দ্রাণী—ঠিক আছে, আমি বলছি, স্পষ্ট করেই বলছি,
তুমি মন দিয়ে শোনো।
তোমার যৌবন যে কোনো কারণে-হঠাৎ কর্পূরের মতো
উবে গেছে, কিন্তু শ্যামল, বা ডাক্তার,
ওরা তো এখনো নিশ্চয়ই যুবক রয়েছে।

ভবভূতি—হ'তে পারে, তাতেই বা কী, তুমি তো ওদের দুজনের সঙ্গেই

প্রেম-টেম করেছো, আমি টের পাই না ভেবেছো,
আর কী ক'রতে চাও বলো ?

ইন্দ্রাণী—না, ঠিক প্রেম নয়। আমার প্রেম তো তোমার সঙ্গেই, ভবভূতি।
আমি চাই একটি সন্তান, হ্যাঁ, একটি সন্তান।
শ্যামল বা ডাক্তার যে কেউ আমার দ্বিতীয় সন্তানের
বাবা হোক, দুজনকেই আমার ভালো লাগে।
আমি জানি, তুমি কোনো আপত্তি করবে না।

ভবভূতি—আপত্তি ক'রবো না ? তুমি কি পাগল হয়েছো, ইন্দ্রাণী।
তুমি কি উন্মাদ হ'য়ে গেছো ?
আমার সামনে একটা জারজ বেড়ে উঠবে,
অমিয় কি শ্যামলের ছেলে কিংবা মেয়ে,
'বাবা, বাবা' ব'লে আমাকে ডাকবে, তাকে
স্কুল কলেজে যখন পাঠাবো তখন ডক্টর ভবভূতি চৌধুরী
তার বাবা, এই কথা লিখতে হবে।
হয়তো অমিয় কিংবা শ্যামল জীবনে এ-বিষয়ে মুখ খুললো না,
হয়তো সন্তানটিও প্রথম প্রথম জানলো না, তার বাবা কে—
কিন্তু যদি জানতে পারে, তাহ'লে সে তোমাকে আমাকে দুজনকেই ঘৃণা করবে,
আর যদি না-ও জানতে পারে, তাহ'লে আমি হয়তো ঘেন্না ক'রবো তাকে।

ইন্দ্রাণী—না, না, সে কোনোদিন জানবে না। তুমিও কখনো তাকে ঘৃণা করবে না।
তাছাড়া আমি তো তার সত্যিকারের মা থাকবো, তুমি যদি
একটু আধটু অবহেলা করো, তা'হলে আমি আমার সমস্ত স্নেহ
আবার উজাড় ক'রে, সব পুষিয়ে নেবো, ভবভূতি।

ভবভূতি—না, না, জারজ পালন ক'রতে পারবো না, ইন্দ্রাণী।
আমি এরকম দু'একটা case জানি, ভীষণ tension হয়
পরবর্তী জীবনে। কেউ কাউকে সহ্য ক'রতে পারে না,
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় নিজেদের।
আর আমি যদি ততোদিনে বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে পরিচিত হই,
তাহ'লে জারজটি সব জানতে পেরেও আমাকে শ্রদ্ধা করবে,
আর লোকে যদি এ বিষয়ে কানাঘুষো করে,
তাহ'লে দেশীমদে ডুবে থাকবে সকালবিকেল,

সমাজের পরগাছার মত বেড়ে উঠবে।
কেউ তাকে সম্মান ক'রবে না এই দেশে ?
সেইসব পুরনো দিনের রাজ-রাজড়াদের কথা ছেড়ে দাও,
Dauphin—ডফিন হয়তো তাদের কথা ভাবছো তুমি
কিন্তু তাদের দিন কবে শেষ হ'য়ে গেছে, তুমি তা জানো না।
নাকি জানো ?

ইন্দ্রাণী (আচ্ছন্ন ভাবে)—জারজ ? জারজ কাকে বলে ? বাবা মার মধ্যে
একজন ঠিক থাকলেই তো হ'লো, তাই নয় ?
কর্ণ কি সূতপুত্র না সূর্যের পুত্র, তা ভেবে
কি কেউ কিছু ওকে করতে পেরেছে ?
অন্যায়-যুদ্ধে ও মারা গেছে, কিন্তু ওর মতো বীর
কে আছে কোথায় চরাচরে, তুমি বলো ?
আর আমি তো কুন্তীর মতো Idiot নই,
যে আমার সম্ভাব্য সন্তানকে, জন্মের পরেই,
জলে ফেলে দেবো ?

(একটু থেমে)

কে কড়া নাড়ছে ? কে ? হাওয়া নয় ? হয়তো মানুষ ?
হয়তো আমাদের দ্বিতীয় সন্তান।
সে হয়তো স্কুল থেকে ফিরে এলো।
এখন বাইরে সব গাছপালা ঝলসিয়ে গেছে।
ও হয়তো ছাতা নিতে ভুলে গেছে,
খুব কষ্ট হয়েছে রাস্তায়।
কে কড়া নাড়ছো, কে ? বলো, কে দাঁড়িয়ে রয়েছো বাহিরে ?

ভবভূতি—তুমি ভুল শুনছো, কেউ কড়া নাড়ছে না ইন্দ্রাণী।
কলু মারা যাবার কয়েকদিন পরে আমিও মাঝেমাঝে ভুল শুনতাম,
আর ভাবতাম স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।
কিন্তু আমি এখন পড়াশুনো নিয়ে আছি, আর নোট-বই লিখবো না,
দু'একটা সত্যিকারের ভালো অ্যাকাডেমিক বই লিখে যাবো ভাবছি জীবনে।
তুমিও তো কবিতা লিখতে একসময়, "দেশ"-য়েও তো দু'একটা ছাপা হয়েছিলো,
তুমি কবিতা লেখার দিকে আবার মনোযোগ দিচ্ছো না কেন ?
নইলে, ডাক্তারের সঙ্গে ব'সে Western Music বিষয়ে

আরো শিখে নাও। শ্যামলের সঙ্গে আলোচনা করো
তোমাদের ফেবারিট সাবজেক্ট, cultural anthropology।

ইন্দ্রাণী—না, না ওসব বিষয়ে আমি আর interest পাচ্ছিনা, ভবভূতি।
আমার বুকের-ভেতর-থেকে-জেগে-ওঠা একটা চাপা গুমরোনো কান্না
পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে আসছে।
আর শীতকালের সেই ধানের চারার বীজন নষ্ট হবার গান
মাঝেমাঝে আজও শুনতে পাই।
চারপাশে নানারকমের শব্দ হয়, ভবভূতি, নানারকমের শব্দ হয়।
তুমি হয়তো শুনতে পাও না, আমি ঠিক শুনতে পাই।
আর যখনই শুনতে পাই, তখনই কেঁপে কেঁপে উঠি।
আর মানুষের এক জন্মের মধ্যে অনেক অনেকবার
ছোটো ছোটো জন্ম হয়। আমি যখনই প্রবলভাবে কেঁপে উঠি
তখনই আবার নতুনভাবে জন্ম নিই।
আর কতোবার, কতোবার, আমি কেঁপে উঠেছি, তা শুধু আমিই
জানি, আমিই জানি.
আমার একটু একটু ক'রে বাকল পাল্‌টে যাচ্ছে,
তবু আমি কাউকে জন্ম দিতে পাচ্ছি না।
এই যন্ত্রণা তুমি বুঝতে পারছো না, ভবভূতি।

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ, ইন্দ্রাণী এক মিনিটের জন্যে উইংসের আড়ালে গেলো। আর তারপর তিনজন একসঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ ক'রলো : ইন্দ্রাণী, শ্যামল, আর অমিয়।)

অমিয় (ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে, মৃদুস্বরে)—আচ্ছা আমি ভেবে দেখবো, ইন্দ্রাণী, আমি ভেবে দেখবো।

শ্যামল- (মৃদুস্বরে --আমিও ভেবে দেখবো, ইন্দ্রাণী, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।

ভবভূতি—কী, ডাক্তার, শ্যামল, তোমরা কি ফিসফিস ক'রে বলছো ইন্দ্রাণীকে।
বলো, আমাকেও বলো, আমি শুনতে চাই।

অমিয়—তোমার বিরুদ্ধে আমরা একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছি, ভবভূতি।
তুমি সাবধানে থেকো।
ইন্দ্রাণীকে ইলোপ ক'রে নিয়ে যাবো ভাবছি ফ্রান্সে, কিংবা
জার্মানিতে।

ভবভূতি—তাই নাকি! তা তোমরা দুজনে মিলে যদি ইন্দ্রাণীকে ইলোপ করো,

তাহ'লে কিন্তু খুব অসুবিধায় প'ড়বে।
বরং, শ্যামল আর তুমি একটা কয়েন টস্ ক'রে ঠিক ক'রে নাও,
কে ওকে নিয়ে ইলোপ ক'রবে।
তারপর… ..

ইন্দ্রাণী— হাঁ, তারপর ?

শ্যামল— হাঁ, তারপর ?

ভবভূতি—তারপর, ধীরেসুস্থে পুলিশ ডাকবো।
সবাইকে জেলে পুরে আমি একটা সিগার ধরাবো।

(ইন্দ্রাণী ছাড়া সবাই হেসে উঠলো ঃ ভবভূতি, অমিয়, শ্যামল।)

ইন্দ্রাণী—চারপাশটা কীরকম ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে।
যেন কেউ কোনোখানে নেই, কিছু নেই।
কালকে জানালা দিয়ে দেখছিলাম, একটা বেড়াল রাস্তা পার হ'তে গিয়ে
হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, যেন চোখ ফিরিয়ে দ্রুত চ'লে গেলো
যেন সবাই বুঝতে পেরেছে আমি করুণার পাত্র, আমি একা,
অথচ আমি কি একা ? ভবভূতি বাড়তেই থাকে
বেশির ভাগ সময়। ডাক্তার, শ্যামল নিয়মিত আসে।
কিন্তু আমি একা, একা, একা,
ভবভূতি যতোই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিক,
শ্যামল কিংবা ডাক্তার…যাক্, এসব এখন
বল'বো না।
শোনো, তোমাদের বলি। তোমরা কারা, তা-ও সঠিক জানিনা
আমাকে তোমরা কী ভাবছো, আমি আঁচ করতে পারছি,
বলো, বলো, বলো। কিন্তু মা হ'তে চাওয়া কি কোনো অপরাধ,
(তারপর একটু চুপ করে, তারপর মৃদু হেসে)
চুপ। কিছু ব'লো না। আমি ঘুমোতে চল্লাম।

চতুর্থ দৃশ্য

জুলাই

(নেপথ্য থেকে ধান বোনার গান ভেসে আসছে। কিছু পরে নাটকের চারটি চরিত্রই প্রবেশ ক'রবে, তাদের মুখে মুখোস, পায়ে নাচের ভঙ্গি।)

ভাজো গান ঃ নামু মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস।

ইন্দ্রাণী— ইস্, ইস্, ইস্,
আমায় নিয়ে কেন এতো ভাবিস
কেন ভাবিস।
হবেই হবে ছেলে আমার, হবেই হবে মেয়ে,
তোরা জানিস, আমার প্রথম মেয়ে ছিলো যে অপ্পেয়ে।
হবেই হবে ছেলে আমার, হবেই হবে মেয়ে।

ভবভূতি— না, না, না, আর ছেলেমেয়ে না
এনে দেবো, ইন্দ্রাণী, আমি চুনিপান্না,

ভাজো গান ঃ নামু মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস

ভবভূতি— না, না, না

ভাজো গান ঃ শালুকের ফুল নিবুন্ধি রেতে কেন ফোটে।
যার সঙ্গে গুপ্ত পিরীত
ও গো সেই তো মজা লোটে

অমিয়— হ্যাঁ, সেই তো মজা লোটে
প্রেমিকাকে নিয়ে সে কুঞ্জবনে ছোটে

শ্যামল— ভ্রমর এসে গুন্‌গুনিয়ে কোথায় যেন জোটে
হ্যাঁ, সেই তো মজা লোটে।

ইন্দ্রাণী— মজা লোটার কথা তো নয়
মজা কে আর লোটে,
দেহের ভেতর অন্ধকারে
আলোর ফুল ফোটে

ভবভূতি— ফুটিয়ে ছিলাম সে-ফুল আমি
কখন গেছে ঝ'রে
সেই থেকে বৌ আমার
গেছে কোথায় স'রে

ডাক্তার— আমার কাছে আছে, ওতো আমার কাছে আছে।
এলে ফাগুন, ফুটবে ফুল আগুনবরণ গাছে।
সে তো আমার কাছে আছে।

শ্যামল— আমার কাছেও থাকে সে তো, আমার কাছেও থাকে—
আমি তাকে জড়িয়ে ধরি কখনো একফাঁকে

ইন্দ্রাণী— আমার চাই পুরুষ, চাই পুংকেশরের রেণু।
কুঞ্জবনে হাওয়া শোনায় মাতাল-করা বেণু।
স্বামী আমার স্বামীই আছে, ছাড়বো তাকে কেন?
কিন্তু আমার সন্তানের পিতা হয় পুরুষ মানুষ যেন

ভবভূতি— এক পা, এক পা, এক পা,
কখনো দুই, কখনো তিন, কখনো চার,
আমার নল, জানি, এখন শুধু ফাঁপা,
কিন্তু আমি সইবো না অনাচার।

ভাজো গান : শালুকের ফুল নিবুদ্ধি রেতে কেন ফোটে
যার সঙ্গে গুপ্ত পিরীত
ওগো সেই তে মজা লোটে

অমিয়— ফোটে ফোটে, ফোটে,
ওগো, পুকুরে ফুল ফোটে,
রক্ত তিলক প'রে আছি
কেন যাবো গোঠে?

শ্যামল— একপায়ে আমিও আছি খাড়া
সা—রা—রা রা রা—রা,
আমাদের দেবে এখন কারা পাহারা।
এক পায়ে আমিও আছি খাড়া।

ইন্দ্রাণী— আমায় তবে হতে হবে স্বয়ংবরা নাকি।
বলে দে না, কাকে নেবো, অচিন দেশের পাখি।
ভেতর থেকে কী যেন আজ করছে ডাকাডাকি।
আমায় হ'তে হবে আমার স্বয়ম্বরা নাকি।

ভবভূতি— ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি।
বন্ধ ক'রে দেবো আমি
সমস্ত চালাকি

(মঞ্চের আলো ম্লান হয়ে এলো, আর নেপথ্য থেকে ভাজো গান :
নামু মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলাই

ইচ্ছে হ'লে ইন্দ্রাণী, তুমি আমার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারো

আমি হয়তো তোমাকে divorce-এর সম্মতি দেবো,
কিন্তু যতোদিন তুমি আমার পত্নী আছো,
ততোদিন ডাক্তার কিংবা শ্যামল কিংবা অন্য কেউ
তোমার সন্তানের পিতা হ'তে পারবে না।

ইন্দ্রাণী— (আচ্ছন্নভবে)—আমিও adoption-এ বিশ্বাস করি না তুমিও ক'রো না
নইলে হয়তো এসব সমস্যা আদৌ উঠতো না জীবনে !
কিন্তু আমি চাই আমার শরীরের রক্তে তিলে তিলে বড়ো হ'য়ে
আবার একটি শিশু জন্ম নেবে।
মন্দিরের গর্ভগৃহ সরু, কিন্তু মন্দির বিশাল।

ভবভূতি— তাহ'লে কী কর'বে, ভেবে দ্যাখো

ইন্দ্রাণী— আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভবভূতি।
divorce-এর কথা আমি ভাবতেও পারি না একবারে।
তাছাড়া, তুমি কল্যাণীর বাবা, তার স্মৃতি এখনো মলিন হয়নি।
আমরা প্রেম ক'রে বিয়ে করেছিলাম।
আমি বুদ্ধিমতী ছিলাম, তাই আমাকে
গ'ড়ে পিঠে মানুষ করতে তোমার বেশি সময় লাগেনি
আমি কি পাগল, যে সব ভুলে যাবো ?

ভবভূতি তবে ?

ইন্দ্রাণী— তবে কিছু নয় ? মাঝে মাঝে সব শুধু শূন্য মনে হয়।
বীরভূমের লাল মাটি, খাঁ খাঁ মাঠ, শস্যহীন জমি,
গাছে পাখি নেই, ফুল কখনো ফোটে, কখনো ফোটে না
আর আমি এই রিক্ততার মাঝখানে মূর্তিমতী রিক্ততা হ'য়ে
ব'সে আছি

ভবভূতি— আমিও তো রিক্ত, ইন্দ্রাণী। তোমার চেয়েও রিক্ত এক হিসেবে।
তুমি শূন্যের ছবি দেখো, আর আমি দেখি
জলাভূমি থেকে ভৌতিক আলেয়ার মতো কে যেন ডাকছে,
অদ্ভুত হলুদ রং, কিছুটা পাঁশুটে আর কিছুটা খয়েরি
আমাকে কি মৃত্যু তবে হাতছানি দিচ্ছে ?
আমি স্পষ্ট জানি না, তবু আলো যেরকম অন্ধকারে মেশে,
কিংবা অন্ধকার মিশে যায় আলোর ভেতরে,
সেরকম বোধের ভেতরে আমি আছি।
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী— (ভবভূতিকে জড়িয়ে ধ'রে)—না, না, ছেড়ে যাবো কেন ?
তুমি তো আমার মেরুদণ্ড, ভবভূতি।
তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে গেলে, আমিও সম্পূর্ণভাবে শেষ হ'য়ে যাবো
তার চেয়ে, এসো আমরা অন্ধকারের দিকে একসঙ্গে জোর ক'রে তাকাই
যদি আলো ফুটে ওঠে।

ভবভূতি— আলো হয়তো ফুটবে না। আলেয়ার মতো কিছু অস্থির কুহক
হয়তো চকিতে দেখা দিয়ে, আবার চকিতে মেলাবে।
তবু, যতো দিন পারি, এসো আমরা একসঙ্গে বেঁচে থাকি।
তিলে তিলে মৃত্যুর কথা অনেকে শুনেছে
তিলে তিলে বেঁচে থাকা কাকে বলে, কেউ কি জেনেছে ?
এসো, আমরা তিলে তিলে বেঁচে থাকি

ইন্দ্রাণী— শূন্যের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো না, ভবভূতি।
তুমি যে আলেয়া দেখেছো, তাও শূন্যেরই আরেকরকম ভোজবাজি।
আমি, তুমি আমাদের ঘরবাড়ি—
সব কিছু একদিন শূন্য ব'লে মনে হবে।
তবু আমরা বেঁচে থাকবো, ভব,
হয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে আবার আমোদ-আহ্লাদ করবো।
তবে এক নাছোড় শকুন ওঁত পেতে থাকবে আকাশে,
সুযোগ পেলেই, নিচে নেমে আসবে ভাগাড়ে।

ভবভূতি— শুনছো, বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটা বন্ধ আছে তো ?
সব জানলা আপাতত বন্ধ ক'রে দাও।
তারপর তুমি আমি একসঙ্গে ব'সে থাকি

ইন্দ্রাণী— চুপ। আরো একটু আস্তে। চুপ করো।
আমাকে আবার সব বুঝে নিতে দাও, ভবভূতি।
আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।
কিন্তু এখন ঝিরঝির বৃষ্টির মতন এক হালকা ব্যথায়
সমস্ত পৃথিবী যেন একটু একটু ক'রে কেঁপে উঠছে !
(তারপর একটু থেমে, জোর গলায়)
আপনারা কে, আমি স্পষ্ট জানিনা।
তবে শূন্য উদ্‌যাপনের জন্যে ভেতরের ঘরে যাচ্ছি ॥
বিদায়, বিদায় ॥

পাঁচটি কবিতা

শ্রীমতী ঋতু গুহ সমীপেষু

ঋতু গুহ, তোমার গান আমার অনেকদিন থেকেই ভালো লাগে।
কালকে যখন রেডিও-তে রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম :
থাকতে আর তো পারলি নে মন, পারলি নে—
তখন আমি তোমায় টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম।
তুমি কিংবা তোমার স্বামী বুদ্ধদেব, কেউ বাড়িতে ছিলে না।
দীর্ঘদিন আগে, বিড়লা কলামন্দিরে, তোমার গান প্রথম মুখোমুখি
শুনেছিলাম,
তুমি একটু হাঁ-ক'রে গাও, শব্দ খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করো,
শুধু কি তাই ? নাকি আরো অন্য কিছু আছে ? তুমি জানো,
আমি শুধু তীব্রভাবে অনুভব করি, প্রায় তৃষিত এক গাছের মতো—
শব্দ আর সুর, আর তার সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে-জেগে-ওঠা
অন্ধকার আবেগ—নইলে তোমার গান আমাকে ঠিক এমন ভাবে
স্পর্শ করতো না। ধরো, কোথাও জল ঝরছে, মাটির ওপর
কেঁপে উঠছে ঘাস-চারা, তখন কেউ কেমনভাবে সাড়া দেবে ?
আমি আমার কথা ব'লতে পারি। আমি জেগে উঠবো চেঁচিয়ে-ওঠা
শিশুর মতো। গান শুনেও মানুষ বাঁচতে পারে।
তোমরা একদিন এসো, তোমার গান ঠোঁটের ওপর মধু-র মতো
একটু একটু ক'রে চেখে নেবো। জড়িয়ে দেবো ইন্দ্রিয় হৃদয়।
কবে আসবে ? কাল তোমায় টেলিফোনে পাইনি।
আজ হয়তো পেতে পারি ॥

টেলিভিশনে সুপ্রীতি ঘোষের গান

সুপ্রীতি ঘোষ, বিখ্যাত গায়িকা, অনেকদিন পরে তাঁর গান শুনে
বুকের ভেতর একটু কেঁপে উঠলো। এরকম হয়, হ'য়ে থাকে।
ফাঁকে ফাঁকে কখন যে এগিয়ে আসে জলধারা, কে তাকে রুখতে পারে,
কেন বা রুখবে, কার দায় !
"ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী, নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে"—
রবীন্দ্র সংগীতে এক মায়া আছে, ইয়েট্‌স জানতেন, এমনকি স্বয়ং লেখক
-নাবালক থেকে আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে শুধু রবিগান।

কিন্তু ভ্রমর ? বিশেষত বিবাগী ভ্রমর ? তার ঘর, কে জানে কোথায় ?
কোন্ কান্নাহাসির কথা শুনতে চায় ও ? কেন চায় ?
কোথাও ফুটেছে পদ্ম, তার রং নীল, সে কিছুটা নিভৃত।
ভীত আমরা কেউ নই, তবুও কেঁপে কেঁপে উঠি মাঝে মাঝে, কাঁপি নাকি ?
সব ফাঁকি মুছে যায়, আঁখি কিছু ভার, অনিবার
কার্যকারণে, মনে মেঘ জমে, মেঘ ভেসে যায়—
বিদায়, হে চপলতা ; বিদায়, সস্তার খেউড়,
বিদায়, আধুনিক বাংলা গান ; বিদায়, মরশুমী বাগান ;
বিবাগী ভ্রমর ওড়ে, পাখা নাড়ে, তারপর আর কিছু নেই ।।

পূরবী

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের গান "একদা কী যেন, কোন পুণ্যের বলে"—
রেডিওতে ভেসে এলো। তার পরের দুটি শব্দ "হে সুন্দর" নিয়ে
কিছুক্ষণ ভাবলাম। নাম যাই হোক, "সুন্দর" কাকে বলে ?
রবীন্দ্রনাথ হয়তো জানতেন, অনেক গানে কবিতায় শব্দটিকে
ব্যবহার করেছেন। অনুভবও করেছেন। ভোর বেলায়, উপাসনার সময়।
হয় এইভাবেই একটা থেকে অন্য একটা কিছুর জন্ম। পূরবী, আপনাকে
অজস্র ধন্যবাদ, আপনি নতুন ক'রে আবার সবকিছু জাগিয়ে দিলেন মনে।
অনেকদিন আগে, সাতান্ন কি আঠান্ন সালে, শিয়ালদার বাড়িতে
আমি এবং যূথিকা ব'লে একটি মেয়ে দেখা করেছিলাম। মনে আছে ?
নবনীতা পাঠিয়েছিলেন। আপনি তখন অন্য একটি গান গেয়েছিলেন :
"তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে, মাটির ঐ কলসখানি ছাপিয়ে গেলো।"
কাল রাত্রে, এই দুটি গান একসঙ্গে মিশে যাচ্ছিলো—
নীল ও সবুজ, সাদা এবং হলুদ কিংবা শুধু জলের সঙ্গে জল
যেমন মিশে যায়, অনেকটা সে রকম। গমগম ক'রে ওঠে শব্দ।
"ঝর্ণাতলা" "কোন্ পুণ্যের বলে" এখন ছড়িয়ে পড়ে
সমস্ত শহরে। আমি ঘরে ব'সে বুঝতে পারলাম,
যাকে আমরা ভালো-লাগা বলি, তার শিহর যে-কোনো দিন,
যে কোনো মুহূর্তে, কেঁপে উঠতে পারে। বারেবারে
আমি শুধু একবার অতীত, আর অন্যবার বর্তমানের মাঝে
সেতু বাঁধতে চাইলাম। পেরেও ছিলাম হয়তো। পারিনি কি,
শ্রীমতী পূরবী ?

মোহিনী অট্টম

প্রথম ফুল-চয়ন, পরে পুষ্পধনু, ছিটকে-আসা তীক্ষ্ম মৌমাছি,
পরে আবার পায়ের তাল সমান রেখে মালা গাঁথা—
মোহিনী অট্টম।
এসেছিলেন মন্দাকিনী ত্রিবেদী, গাছগাছালি-ভরা কেরালায়,
টেলিভিশন দেখতে দেখতে আমি শুধু মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছিলাম
হাতে যেন একটু একটু ক'রে ফুল-ফোটার মতো মুদ্রা, একবার
ওপর দিকে তোলা, অন্যবার আরো একটু নিচে—
আলো আঁধার-দিয়ে বোনা, আনমনা, চঞ্চলিত, চপল,
পুরো জীবন যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো হাওয়ায়—
কোথায় কবে সব কিছু পাথর-ফাটা জলের মতো চমকে উঠেছিলো
এখনো তা বহে যাচ্ছে, আমরা শুনি, কখনো শুনি না
কে যে কাকে নাচায়? যায়, একটা জীবন পুরো বুঝে নিতে।
রমণী শুধু কমণীয় শরীর নয়, আগুন দিয়ে ঘেরা
মস্ত এক অন্ধকার, সাচীকৃত, প্রাচীন....
আমি শুধু তাকিয়ে দেখছিলাম
কেমন ক'রে মন্দাকিনী দেবী
সব কিছু ছুঁয়ে, আবার ছুঁড়ে দিচ্ছেন ঘূর্ণ্যমান আলোয়
ঘুঙুর-পরা পায়ের সেই পুরনো রম্ ঝম্—
মোহিনী অট্টম॥

যামিনী কৃষ্ণমূর্তির "সপ্তপদী"

টেলিভিশনে, যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ''সপ্তপদী'' দেখে মনে হ'লো
আমি আবার নতুন ক'রে
জন্মজীবনের সঙ্গে, বিবাহে চলেছি।
ও'র পায়ের তালে যেন ছোটো ছোটো ঢেউয়ের টুকরো
আছড়ে পড়তে চেয়েছিলো এই বুকের ওপরে।
আমি তাদের সামাল দিতে গিয়েও কেন শেষাবধি
পেরে উঠতাম না, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।
কামনা এক অন্ধকার সমুদ্র, লালের-ছিট-লাগা,
তাকে আমি কেমন ক'রে ফিরিয়ে দেবো ?
যদিও বিবাহ প্রধানত শাসন-মানা-ছন্দ, আলোড়ন।
আমি এখন তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি আরো বাইরে
যেখানে পুরো জীবন থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে পায়ের পাতার নিচে,
বট-অশথ ঝুরি নামায়, ঝুরি নামায়, ঝুরি—
শিকড়বাকড় জড়িয়ে আছে, সেখানেও নৃত্যেভঙ্গিমা।

আমি এখন, অনেক দিন পরে,
জন্মজীবনের সঙ্গে বিবাহে চলেছি।
ধন্যবাদ, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ॥